সাগরে হাঙরে

সাগরে হাঙরে

শেফালি নন্দী

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মায়ের

পুণ্যস্মৃতির

উদ্দেশে—

লেখিকার অন্যান্য বই ঃ

॥ সন্ধানীর চোখে পশ্চিম ॥

॥ পান্নাদ্বীপ ॥

॥ Bengali For Foreigners ॥

অনুবাদ ঃ

॥ জয়াশুরার কথা ॥

॥ ভিটিয়ার কাণ্ড ॥

॥ বরফের দেশে আইভ্যাম ॥

॥ ইভান ইভানোভিচ ॥

সাগর দেখেছেন অনেকেই, কিন্তু হাওর দেখেন নি বোধ হয় তাদেরও অনেকে। কারণ এটা পুর্ববঙ্গেরই বিশেষত্ব। বর্ষায় উপ্‌ছে পড়া নদী আর ঝরে পড়া মেঘ তাদের সমস্ত জল এনে ঢেলে দেয় নিম্নভূমিতে, ধানের ক্ষেতে, কচি ঘাসের মাঠে। পাল্লা দিয়ে বাড়ে সে জল নালিয়ার গাছ আর আকাশের মেঘের সঙ্গে। গগনললাট অবারিত মাঠ তখন হারিয়ে যায় দিকচক্রমেখলা সাগরের অতলে। যাঁরা দুটোই দেখেছেন তাঁরা জানেন সাগরে আর হাওরে তফাৎ নেই বিশেষ এক জলের স্বাদ ছাড়া। সাগরের জল লোনা আর হাওরের জল মিঠা। সাগরের বুকে পড়ে নীল আকাশের ছায়া আর হাওরে মুখ দেখে পুর্ববঙ্গের নীলাভ ধূসর আকাশ। প্রকৃতিদেবীর সামান্য উস্কানি পেলে তরঙ্গবাহু মেলে সে ধরতে চায় ম্লান বৃত্তাকার নভোমণ্ডলের সীমানা। আবার প্রশান্তরূপে এই হাওরই দিয়েছে কৃষ্ণধামালি, ভাটিয়ালী আর মনসামঙ্গল। ময়মনসিংহের গীতিকবিতার নির্ঝর ছাড়া পেয়েছে এই হাওরেরই অঙ্ক থেকে। আবার হেমন্তে এই হাওরই যত উদ্দামতা ঘুচিয়ে দুকূলপ্রসারী মাটির বুকে ঢেলে দিয়েছে কনকধান্য। এদের তুলনা নেই।

সাগরে হাওরে *

নদীর পাড়ে এসে থামল তারা। কমলরাণী, শিউলী, বকুল, মালতী আর চাঁপা। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ফুলের সাজি, সামান্য কিছু শিউলী কুড়িয়েছে তারা। কারো সাজিতে বা একটি দুটি জবা, করবী, এমনি যে যা হাতের কাছে পেয়েছে। কিন্তু আর ত এগোন যায় না। অথচ পূজার আর বেশীদিন বাকী নেই, এখনও যদি পাড়ার সব কয়টি শিউলিতলা দখল করা না যায়, ছেলের দলের কাছে হেরে যাবে না ওরা? তাহলে, কোন্ লজ্জায় আর পাড়ায় মুখ দেখাবে? অরুণ, কিরণ, হারু, সুচারু, অমল এরা তাহলে দেখা হলেই হাততালি দেবে আর রটিয়ে বেড়াবে এতকালের ঠোঁট উল্টানো মেয়ের দল পূজার সময় শিউলী যোগাড় করতে পারল না, খালি নদীতে পড়ে সাঁতার দিতেই ওস্তাদ। কাজের বেলা সব অষ্টরম্ভা। অতএব নদীর পাড়ে ল্যাম্প-পোষ্টটার চারদিকে গোল হয়ে বসে জটিল পরামর্শ আর আলোচনা শুরু হল।

কমলরাণীই সবার আগে জিজ্ঞাসা করল, "সত্যি করে বল্ দেখি, কি দেখেছিস্ তুই, না কি ঘুমের ঘোরে ভুল দেখেছিস?"

রেগে গেল চাঁপা, "আমাকে কি বোকা পেলি নাকি তুই? রোজই ত ফুল তুলতে আসি, কোন্দিন আবার ভয়ে

---

* সাগর—সায়র—হায়র—হাওর। (দীনেশচন্দ্র সেন)

পিছিয়ে যাই। ঠাকুরমা বলে দিয়েছে অত ভোরে যাবি না, এখনও আকাশে তারা রয়েছে, পরীদের এখন ফুল ফোটাবার সময়, তা সেকথা কি আর আমি শুনি! তাই না পরীরা রাগ করে অমন বিশ্রী রূপ নিয়ে আমাকে ভয় দেখাল! না হলে পরীরা ত দেখতে সুন্দর, সেই যে ছবির বইটায় আছে ছোট ছোট হাত পা, পিছনে তাদের পাখা থাকে; আর এ একেবারে বিকট হাঁ করে আমায় যেন গিলতে এল।"

সবে এসে মিলেছে এদের সঙ্গে বাণী, বুদ্ধিটা তার খোলে একটু দেরীতে। সে বলে বসল, "কোথায় রে, সেই চৌধুরীদের তালগাছতলায়?"

ধমক দিয়ে উঠল বকুল, "জানিস্ ত জায়গাটা খারাপ আবার জিজ্ঞেস করছিস্ কেন? আর তুই চাঁপা, বড় ভীতু, সবগুলো ফুল গেল এখন ঐ অরুণদার পাল্লায়। নে ওঠ্ সব। দেখি সাহাদের বাড়ীর পিছনের নীলকণ্ঠ গাছটায় কটা ফুল আছে, নীলফুল না হলে আবার মাসীর পূজা হবে না আজ।" উঠে পড়ল সবাই।

এদিকে ছোট চন্দনী নদীটির জলে পড়েছে সোনালী রঙ্। ভোরের হাওয়ায় আস্তে আস্তে নেচে চলেছে ছোট ছোট ঢেউগুলি। থেকে থেকে সোনালী, লাল, জরদ রঙের ঢেউগুলি যেন এই কচি প্রকৃতির সন্তান ক'টিকে জানাচ্ছে সস্নেহ অভিবাদন। শরতের নির্মল আকাশ, পূর্ণযৌবনা স্রোতস্বিনী, আর ঊষার স্নিগ্ধ বাতাস মিলে তটভূমিকে করে তুলেছে মনোরম।

একটি ছুটি করে বৃদ্ধের দল প্রাতর্ভ্রমণে এসে হাজির হলেন এখানে। তখনও এই ছোট্ট সহরটির নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। দক্ষিণারঞ্জন চক্রবর্তী, নীলকমল চাটুজ্যে, প্রসন্ন চৌধুরী, অবিনাশ রায়, নরেন্দ্র গুপ্ত সকলেই হাজির। প্রাতঃকালীন বায়ুসেবনের সঙ্গে সঙ্গে চলল পরচর্চা প্রসঙ্গ। "আর দেখেছ দেবীপ্রসাদের মেয়েটা এতবড় হল, তবুও সারাদিন বাইরে বাইরে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলবে, কোথায় জাম কুড়াবে, তাল কুড়াবে, কালে কালে হল কি ?"

বাধা দিলেন প্রসন্ন চৌধুরী, "আর সেদিন দেখি কি, নরেন্দ্রদের আমগাছে বসে কাঁচা আম নিয়ে খুব চিবাচ্ছে, হাতে একটা গর্তকরা ঝিনুক, আর একটা ডালে কে বসেছিল তাত আর দেখতেই পেলাম না,—মনে হল যেন শশী কামারের ছেলেটা।"

এবার কথা বললেন দক্ষিণা চক্রবর্তী, "কি যে বল তোমরা। ঐটুকু কচি মেয়ে দশ-এগারো বছর বয়স, তার অমনি বেচাল দেখলে তোমরা। আহা, কতকাল ধরে মা অসুখে ভুগছে, বাড়ীতে দেখবার শুনবার কেউ নেই, তায় আবার সারাদিন বয়ে বেড়াচ্ছে আর একটা বাচ্ছা। অমন মায়ালাগান মুখখানি, রুক্ষ চুলের বোঝা মাথায়, কেমন যেন আদর করতে ইচ্ছা করে।"

বয়োজ্যেষ্ঠ দক্ষিণা চক্রবর্তীর তিরস্কারে যেন মনে হল বৃদ্ধের দল একটু লজ্জিত হলেন। "সত্যি দেবীপ্রসাদ-এর স্ত্রীর শরীরটা আর ফিরল না। অথচ কি কাজের ছিল

মেয়েটা। ক্রিয়াকাণ্ডে, যজ্ঞবাড়ীতে যেখানে ডাক পড়েছে একাহাতে ভার সামলাতে পিছপা হয়নি। আর আজ তারই ঘরেদরজায় পা দিতে ইচ্ছা করে না এমনি অবস্থা।”

“তা দেবীপ্রসাদ ত মোটামুটি গুছিয়ে এনেছে বড় দুটো ছেলে ত দিব্যি সাবালক হয়ে উঠল, বড় মেয়েটারও বিয়ে দিয়েছে বেশ ভালই, আর বাকী রইল দুটো ছেলে, দুটো মেয়ে। ওদের স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই শাসন বড় কড়া। ছেলে-মেয়েগুলো ঠিক মানুষ হয়ে উঠবে।”

“কথাটা মিছে বল নি, কিন্তু ভাবছি আজ যদি দেবীপ্রসাদের স্ত্রীর কিছু একটা হয় কালই ঐ মেয়ে দুটোর খোয়ার শুরু হবে। কে করবে দেখাশোনা, ঘরদুয়ারের যা শ্রী হয়েছে এখনই, ভাবলেও ত ভয় হয়।”

নীলকমল চাটুয্যে এবার বললেন, “আরে দাদা, এই দেবীপ্রসাদ ত আমার চোখের সামনেই বড় হল। এখনও যেন দেখতে পাই, সেই আঠার বছরের গৌরবর্ণ ছেলেটা স্বর্গত রায়মশায়ের কাছারী বাড়ী থেকে পড়াশোনা করতে লাগল, আস্তে আস্তে পাসটাস করে কোর্টে বার হতে লাগল। এই জায়গাটুকু কিনে নিয়ে ঘর বাঁধল, বিয়ে থা করল, সংসার হল জমজমাট। আজ তার মুখের উপর দাঁড়িয়ে সওয়াল জবাব করে এমন শর্মা এই রাজপুরে কেন জেলায়ও আছে কিনা সন্দেহ। আয় তার আজ হাজার টাকা। পুরুষ বটে দেবীপ্রসাদ, একেবারে পুরুষসিংহ। যেমন চেহারায়, তেমনি কাজেকর্মে।

আর সেই যে শাস্ত্রে বলেছে না "উদ্যোগীনাং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" এও যেন তাই।"

"আর দেবীপ্রসাদের বিয়েটাই কি কম উত্তেজক ব্যাপার? দেওয়ান বাড়ীর মেয়ে, কপালঠুকে বিয়ে দিল কিনা চালচুলো-হীন ছেলের সঙ্গে, আর আজ দেখ কপালগুণে সে মেয়ের ঐশ্বর্য।"

"আরে দেওয়ানের ঐ মেয়েটাই যে বাপের মত কালো, বাপ-গড়া মেয়ে আর মা-গড়া ছেলে ভাগ্যবান হবে এ ত জানা কথা। বাপের চেহারা নিয়ে ঐ পয়মন্ত মেয়ে যে সঙ্গে ভাগ্য নিয়ে আসবে তার আর সন্দেহ কি? ঐ যে আসছে দেবীপ্রসাদ—কি দেবীবাবু, আজ যে এত দেরী? আপনি ত সকলের চেয়ে আগে আসেন।"

"আজ আমার স্ত্রীর দেহটা ভাল নেই একেবারেই। কাল সারারাত ঘুমাতে পারেন নি, ভোরের দিকে সামান্য একটু তন্দ্রার মত হয়েছে, তাই ছেলেমেয়েগুলোকে চুপি চুপি জাগিয়ে পড়তে বসিয়ে তবে এলাম। না হলে হৈ চৈ বাধাবে একেবারে।"

প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালেন অবিনাশ রায়, "আপনি এতও পারেন মশাই, আর তাই আপনার ছেলেমেয়েগুলোও হয়েছে যেন রত্ন। তা কমল বাড়ী ফিরেছে?"

"কমলকে আপনারা পেলেন কোথায়? সে ত দেখি আজ খুব সকালেই পড়তে বসেছে। ফুল তুলতে এদিকে এসেছিল বুঝি? নাঃ, এই মেয়েটাকে নিয়ে আর আমার শান্তি নেই।

নিজের বাড়ীতে এত ফুল তাই কে নেয়, আর ও গেল কিনা পাড়ার ফুল চুরি করতে।”

বাধা দেন তাড়াতাড়ি দক্ষিণাবাবু, “আরে যেতে দাও ভাই, ছেলেমানুষ, বাচ্চাদের সঙ্গে একটু খেলবে, বেড়াবে তবে না মন, স্বাস্থ্য দুইই ভাল থাকবে। আর কি নিয়েই বা থাকে। মাকে কাছে পায় না, তোমার কাছে ত ভয়েই ঘেঁষতে পারে না, তার উপর ছোট বোনটাকে বয়ে বেড়াতে হয় সারাদিন।” মেয়েটার উপর তার সত্যিই মায়া পড়ে গিয়েছিল। দেবীপ্রসাদের যা রাগ, একেবারে চণ্ডাল। রাগলে আর জ্ঞান থাকে না, আবার এদিকে ঠাণ্ডা হলে একেবারে জল। আর তাকেই বা দোষ দেবেন কি! সারাদিন কোর্টে মক্কেল হাকিমের চিন্তা, তার উপর সংসারের ছেলেপুলের ভারও তার উপর। রুগ্না স্ত্রী, তার ডাক্তার-কবিরাজ ওষুধপথ্য ত আছেই। এত টাকা খরচ করেও ফল পাওয়া যাচ্ছে না কিছুই। দুদিন ভাল থাকে ত তিনদিন অসুখ। এতে কারই বা মেজাজ ঠিক থাকে।

বৃদ্ধের দল একটু বিষণ্ণ হলেন, তখনও পর্যন্ত পরের বিপদে-আপদে দুঃখিত বা চিন্তিত হওয়ার রেওয়াজ বাংলাদেশ থেকে লুপ্ত হয়ে যায় নি। বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন সবাই। মৃদুস্বরে বললেন প্রসন্ন ডাক্তার, “একবার বাইরে কোথাও চেঞ্জে পাঠালে পারতেন দেবীদা, হয়তো কিছু উপকার হত। আর কলকাতার ডাক্তার-কবিরাজ বোধহয় আমাদের থেকে ভালই চিকিৎসা করবে।”

"কলকাতা সে কি এখানে নাকি হে! যার নাম সেই তিন-চারশ মাইল। পারবে নাকি এই রোগী সেই ধাক্কা সামলাতে। তার আগেই ত টেঁসে যাবে। এখন তবু রোগী হোক যা হোক ঘরে শুয়ে আছে—মনে একটা ভরসা আছে।"

ইতিমধ্যে পা চালিয়েছেন সবাই বাড়ীর দিকে। পূর্ণকায় তরুণ ভাস্কর দেখা দিয়েছে পূব আকাশে—দিনের কাজকর্ম এবার শুরু করার সময় হল। দুপাশে বুনো ঝোপঝাড়ের জংগল থেকে শিশিরভেজা সুবাস আসছে মৃদু মৃদু হাওয়ায়। বাঁহাতে সরু কালীবাড়ীর গলিটা পার হয়ে গোটা কয় বাড়ীর পরই লাল রং-এর ছোট বাড়ীটার সামনে সবুজ লন। মেহ্‌দী গাছের বেড়ায় যেন শোভা খুলেছে তার। দেবীপ্রসাদের পছন্দ আছে, এই সবই তার নিজের হাতে করা। যা নিজে পারেন নি, সামনে দাঁড়িয়ে মজুর দিয়ে করিয়েছেন। রাস্তার বিপরীতদিকে হলুদ রং-এর দোতলা বাড়ীটা যেন এই সামনের বাড়ীটার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। দেবীপ্রসাদ বাড়ীর ভিতর ঢুকলেন। দু'দিকের বাড়ীগুলো থেকে তখন তারস্বরে পড়ার আওয়াজ আসছে—"বঙ্গদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর,·········।"

দুই

পূজা এসে গিয়েছে। চারদিকের চেহারা বদলে গিয়েছে একেবারে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে আগমনীর সুর। আকাশে হাল্কা সাদা টুকরো টুকরো মেঘ ছুটাছুটি করছে হাত ধরাধরি করে। তাদেরও মনে লেগেছে পূজার পরশ। পচা ভাদ্রের গরম কেটে গিয়ে কেমন স্নিগ্ধ আমেজ এসেছে হাওয়ায়। ভোরের বেলা বাড়ীতে বাড়ীতে শিউলীর লেগেছে মরসুম। ছেলের দল পাঠ্যপুস্তকের হাত থেকে রেহাই পেয়ে মহানন্দে মেতেছে উৎসবের আয়োজনে। অভিভাবকদের কড়া মেজাজেও যেন লেগেছে শরতের হিমেল হাওয়ার পরশ। তারাও একটু রাশ আলগা দিয়েছেন এখন। মায়েরা ব্যস্ত পূজার 'জোগাড়ে। মাকে আনার সৌভাগ্য যাদের হবে না, যাদের বাড়ীতে পূজা হবে না তারাও পূজা বাড়ীর কাজ হাতে নিয়েছেন।

চন্দনীর জল কানায় কানায় ভরে উঠেছে। কে বলবে শীতকালে এই চন্দনীর বুকেই গা ডুবিয়ে ভেসে থাকে গরু-মোষের দল। যার ঢালু দুই পাড়ের একেবারে নীচে উঁকি মারে একটুখানি টলটলে জল, সেই চন্দনী আজ পূর্ণযৌবনা। বৃষ্টিও আর নেই, চারদিকেই কেমন যেন প্রসন্নতার ছায়া। শিউলীর গন্ধে ভরপুর আকাশবাতাস, যারা শেষরাত্রে ফুটেছে তারা ঝরে পড়েছে, যারা ফুটি ফুটি করছে তারাও আস্তে আস্তে

সুগন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে শরতের হাওয়ায়। ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে করবীর ঝাড়, টগর আর জবা। অপরাজিতার লতা উঠেছে মল্লিকদের চালে। সাদা আর নীল ফুলে যেন পাল্লা দিয়ে চলেছে আকাশের হাল্কা মেঘের সঙ্গে। তরুলতার ঘোর লাল ফুলের নিশান হাতছানি দিয়ে ডাকছে দূরের পথিককে। মাধবী সেজেছে স্তবকে স্তবকে লাল সাদা রঙে। প্রজাপতি আর মৌমাছির দল দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ ফুল থেকে ও ফুলে, এ ঝোপ থেকে ও ঝোপে, সবারই নিমন্ত্রণ রাখতে হবে অথচ কারটা আগে রাখবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

বাড়ী যাদের দূরগ্রামে তারা এবার উৎসাহিত হয়ে উঠেছে ছেলেমেয়ে, বৌ নিয়ে নৌকা করে যাবে পৈতৃক ভিটায় ছুটিটা কাটিয়ে আসতে। আধা সহর এই রাজপুর—ডাক্তার, বদ্যি, উকীল-মোক্তার, মাষ্টার-প্রফেসর, মুন্সেফ-পেস্কার, চাকুরে-ব্যবসাদার সকলেরই বাসা এখানে, অথচ কারোরই সাত-পুরুষের ভিটা নয় এটা। সাময়িক প্রয়োজনে যিনিই এসেছেন তিনিই ভালবেসে ফেলেছেন একে, বসবাস করে সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন, একে ছেড়ে যেতে মন কাঁদে সবারই, অথচ পৈতৃক ভিটার মায়া অনেককেই ডাকে শারদীয়া আগমনী সঙ্গীতের সুরে। ঘরমুখো বাঙ্গালী তাই সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে না—ছুটিটা কাটাতে চায় আত্মীয়পরিবৃত হয়ে। বছরের প্রবাসবাস সার্থক হয়ে উঠুক এবার।

চাঁপা আর কম্‌লি এসে ঘাটে নামল। উঃ, জলটা কি ঠাণ্ডা! পাশ থেকে হেঁকে উঠল শান্তি আর অমল, "তোরা

এতক্ষণে এলি, আমাদের এদিকে বার ছয়েক পারাপার করা হয়ে গেল।"

কম্‌লি জবাব দিল ক্ষুন্নকণ্ঠে, "আমাকে মা বারণ করেছে পারাপার করতে। বর্ষার জল—যদি অসুখবিসুখ করে, তাহলে আর বাড়ী যাওয়া হবে না। সবাই যাবে মজা করে, আর আমি এখানে পড়ে থাকব একলা বাড়ীতে।"

অবিশ্বাসের হাসি হাসল অরুণ, "যাঃ যাঃ ভারী মাতৃভক্ত হয়েছিস্! পারাপার করতে বারণ করেছে না আরও কিছু! তার থেকে বল্ ভয় পাচ্ছিস, নেহাৎ-ই মেয়েছেলে না হলে আর এটুকু জলে ভয় পাস্? দেখ দেখি আমরা ত রোজই কতক্ষণ ধরে সাঁতার কাটি, কখনও অসুখ করতে দেখেছিস্?"
"নে নেমে পড়, মনে নেই আসছে সোমবার সাঁতারের কম্পিটিশন হবে। এখন থেকে অভ্যাস না করলে পারবি কি করে? অবিশ্যি তোদের মেয়েদের ত হবে আলাদা ঘাটে কম্পিটিশন—কতটুকুই বা সাঁতার কাটতে দেবে—হত আমাদের—তা হলে বুঝতি!" ধূয়া ধরল অমল।

তার নারীত্বের প্রতি এতবড় আক্রমণে কম্‌লি এবার আর স্থির থাকতে পারল না—ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে—আর তারপর কে শোনে কার মানা। মনেই বা আছে কার এই কাঁচাজলে এতক্ষণ থাকতে নেই। দাপাদাপি, তুমুল চীৎকার আর জল ছিটিয়ে প্রতিযোগীদের চোখমুখ বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে সকলেই মত্ত হয়ে পড়ল। পাড় থেকে শুধু শোনা যেতে লাগল "হেরে গেল ছয়ো" "এই চাঁপা ডুব সাঁতার দিয়ে

জিতলে কি হবে, চিৎ হয়ে দে দেখি।” “না ভাই পা দিয়ে জল ছিটালে খেলব না···” এই সব। পাড়ে দাঁড়িয়ে কম্‌লিদের দাসী মাতঙ্গিনী যে অনবরত চীৎকার করে চলেছে, “ও কম্‌লি—ও চাঁপা তাড়াতাড়ি উঠরে, ইস্কুলের বেলা হইয়া গেল যে—কি দস্যি মেয়েরে বাবা, ছেলেগুলার সঙ্গে সমান তালে নাচ চালাইছে। একটু কি হুঁস আছে এত যে ডাকছি··· ।”

বেলা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। নদীর এপারে ওপারে যে রাস্তা—তার উপর দেখা যাচ্ছে প্রাণের স্পন্দন। বাবুরা কেউ কেউ পান চিবাতে চিবাতে চলেছেন—তারা কেউ কাজ করেন পোষ্টঅফিসে—কেউ সাবরেজিষ্ট্রারী অফিসে না হলে এই সাড়ে নয়টার সময় ওদের খাওয়াদাওয়া সারার কথা নয়। আর ওদিকে ওপারে দেখা যাচ্ছে প্রতুল চৌধুরীর বাড়ী থেকে কে যেন বেরিয়ে আসছে গামছা হাতে। ওমা—তাইত—বাবু নিজেই যে—আজ তাহলে সেই মোকদ্দমার তারিখ পড়েছে। না হলে প্রতুল চৌধুরী বাবু এত তাড়াতাড়ি আবার কোর্টে যান কবে! এপারের রাস্তা দিয়ে কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ী চলে গেল ধুলো উড়িয়ে—সাড়ে দশটার গাড়ী ধরবে নিশ্চয়। গাড়ীর পিছনে সীটটার উপর দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সন্তা। সে একাধারে কুলি—আবার কারো বিপদেআপদে ডাকের মাথায় হাজির। অসুখ করেছে—ডাক্তার ডাকতে হবে—সন্তাকে খবর দিলেই হল—বাস্‌ নিশ্চিন্ত। ডাক্তার ডাকবে, ওষুধ আনবে—চাই কি দরকার হলে সাবু-বালিও

সে-ই এনে দেবে। কোন তরুণী বধূ হয়ত বাজার করাবার লোক পাচ্ছে না—স্বামী কোন কাজে মফঃস্বলে গিয়েছেন—ছেলেমেয়েরা নেহাৎই ছোট, সন্তা সেখানে হাজির। "ও বৌদি, দ্যান দেহি, বাজার করন লাগব ত ?"

"তুই কেমন করে জানলি রে সন্তা ?"

"বা! আমি জানতাম্ না, আমিই ত কাইল বড়দারে গাড়ীত তুইল্যা দিয়া আইলাম !"

বধূটি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, "বাঁচাইলি রে সন্তা! এই নে, চাইর পয়সার দুধ, আর এক পয়সার মিছরী, তুই আনার মাছ আর তিনটা পয়সা রাখ্ তর যা ইচ্ছা আনিস্।"

হা হা করে হেসে উঠল সন্তা, "আমার ইচ্ছায় আপনে খাইবেন নাকি ? আপনের কি খাওনের আউস্ হইছে তাই কইন, আমি লইয়া আহি।"

"না রে সন্তা, তুইও এবেলা এখানেই খাইস্, তর ইচ্ছামতই আনিস্।"

ব্যস্। সে দিনের মত নিশ্চিন্ত সন্তা। এতক্ষণে ছেলে-মেয়েরা কলরব করে উঠেছে সন্তাকে ঘিরে। "ও সন্তাদা, একবার শিয়াল ডাক না" "ও সন্তাদা একবার বিড়াল ঝগড়া শুনাও না।" "ও সন্তাদা তোমার মত ডাকতে শিখাইয়া দেও না।"

"আরে রাখ্, রাখ্, তরার মার বাজারটা কইরা লইয়া আহি আগে। অখন তাড়াতাড়ি আছে, এই কি ঝগড়া হুনবার সময় নাকি ?" কৃত্রিম ক্রোধে গর্জন করে হাত-পা

নেড়ে ছেলেমেয়েদের তাড়া করার ভঙ্গী করল সন্তা। হৈ হৈ করে ছেলেমেয়েরা এ ওর গায়ে পড়ে সরে গেল।

সন্তার কালো পাথর কেটে গড়া কুচ্‌কুচে কালো দেহ—লম্বা লম্বা পা—মাথায় কোঁকড়ানো বাবরি চুল ঘনকালো বলিষ্ঠ দেহের সঙ্গে কেমন মিশ খেয়ে মানিয়ে রয়েছে। পরণে ছাই রংএর একটা হাফপ্যাণ্ট, কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা—তার উপর একটা লাল তাঁতের গামছা এক ফেরতা দিয়ে বাঁধা। মোট বইবার সময় গামছাটা বিড়ে পাকিয়ে মাথায় রেখে তার উপর বাক্সটা চাপায়, তার উপর বিছানা—হাতে নেয় সুটকেশ বা বেতের ঝড়ি, অবলীলাক্রমে সে হেঁটে চলে—মনে হয় না তার হাতে মাথায় এত বোঝা। সন্তা যে কবে কোথা থেকে এই রাজপুরে এসে বাসা বেঁধেছে কেউ জানে না। তার কথাবার্তায় হকারান্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার বেশী দেখে কেউ কেউ অনুমান করে বাড়ী তার বিক্রমপুর অঞ্চলে। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে বলে "বিক্রমপুর! হেইডা আবার কুন দেশে গো!" তার মা-বাবা, ভাই-বোন আছে কিনা তাও কেউ জানে না। জিজ্ঞেস করলে বলে, "নাই আবার। অতগুলান মা-বাপ আছে এই সহরে আরও চাও নাকি তুমরা?" ঘুমায় সে ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে—সিকি-আধুলি যা পায় তাই তার আয়। লোভ নেই, নির্লোভও নয়। যে যা দাও হাত পেতে নিচ্ছে, না দাও জোর করবে না। রথ, ঝুলন, বারুণী, অষ্টমীতে, কারোর বাড়ী হয়ত গিয়ে বসে পড়ল বারান্দায় "কি গো খুড়িমা আমার পার্বণী

কই ?" নয়ত বলল "ও মামা চাকরী পাইলেন যে আমার বকশিসটার কথা মনে নাই বুঝি ?"

সর্বত্র সন্তার অবারিত গতি। কি আব্দারে, কি কাজের বেলা, সর্বত্র তার প্রকাশ। আজ বোধহয় ভট্টাচার্য মশাইরা বাড়ী যাচ্ছেন এই সাড়ে দশটার গাড়ীতে। তাদের আর কি, ইস্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছে, বন্ধ এখন পাকা একমাস। হারু, প্রীতি আর ইন্দু ওরাও ত সবাই ওই স্কুলে পড়ে। আর ঐ যে হারু ফি বছর ফাস্ট হয় ছেলেদের ইস্কুলে, গাদা গাদা প্রাইজ পায়। প্রীতি আর ইন্দুও ত এবছরই ভর্তি হয়েছে। ওরাও হয়তো পড়াশোনায় ভালই হবে। সেদিন অমলের মা বলছিলেন, "ভট্টাচার্যিদের গিন্নী যেন রত্নগর্ভা। এই ত সবে ওদের বাড়ীর মেয়েরা ইস্কুলে পড়তে আরম্ভ করেছে। এরই মধ্যে কেমন ভাল ভাল নম্বর পাচ্ছে। আর আমার ছেলে দেখ কোথায় সাঁতার কাটছে, কোথায় কার বাড়ী জাম পেড়ে খাচ্ছে, পড়ার নামে একেবারে গায়ে জ্বর আসে। নেহাৎ পরীক্ষাগুলো কোনরকমে পাশ করে না হলে কি যে উপায় হত, কে জানে ?"

ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন অমলের ঠাকুরমা, "কি যে বল বৌ, কি আবার হত ? ও ছেলেকে পড়াশোনায় কেউ আটকাতে পারে ? আজকালই অমল একটু অন্যমনস্ক হয়েছে, আর করবেই বা কি ? ঐ যে নতুন হেডমাষ্টার হয়ে এসেছে ঐ ভট্টচার্যি, ওর ছেলের জন্যই ত আর অমল বেশী নম্বর পায় না।"

"কিন্তু মা, ও ত মেয়ে ইস্কুলের মাষ্টার—তার সঙ্গে ছেলে ইস্কুলের সম্বন্ধ কি ?"

"কি যে বল বৌ। এমন বুদ্ধি না হলে কি অমন কপাল হয়। ঐ যে ছেলে ইস্কুলের হেডমাষ্টার হরিশ চক্রবর্তী ওর মেয়ে ত ঐ মেয়ে ইস্কুলে পড়ে না ? তবে ? ঈশ্বর ভট্চার্যির ছেলেকে বেশী নম্বর না দিলে হরিশ চক্রবর্তীর মেয়ে কি করে বেশী নম্বর পেয়ে ক্লাসে উঠবে ? আর সেজন্যই ত আমাদের অমল নম্বর পায় না মোটে। এই সোজা কথাটা তুমি বোঝ না, তোমার বাপ-মা তোমায় কি খাইয়ে মানুষ করেছিল গো ? আমি মরলে তুমি খাবে কি করে তাই ভাবি। ছেলেমেয়েগুলো ত রাস্তায় রাস্তায় বেড়াবে।" বলিয়া মহাচিন্তায় মনোরমার শ্বাশুড়ী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

এমনি ছিল তখনকার দিনে শ্বাশুড়ী বউয়ের সম্পর্ক। ভয়ে সে বেচারা আর কিছু বলতে পারল না। কিন্তু শ্বাশুড়ীর সঙ্গে একমতও হতে পারেনি। তাই অমলকে মারধোর, বকুনি দিতে কসুর করেন নি অমলের মা। ঠাকুরমা সর্বদাই তাকে আড়াল করে রাখতেন তাই বিশেষ কিছু করারও উপায় ছিল না। সাঁতার কেটে, পরের গাছের জাম, জামরুল খেয়েই দিন কাটছিল তার। যদিও পরীক্ষা পাস করতে কোন অসুবিধা ছিল না। আগামী সোমবার সাঁতারের কম্পিটিশনে সে-ই যে মেডেলটা নেবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না তার, তাই অমল নিশ্চিন্তে কম্‌লির পিছনে লাগতে পেরেছিল।

এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল মাতঙ্গিনী, "এই আমি চললাম, ঠাকরুণরে গিয়ে বলি, কমলির উঠবার নাম নাই। ওরে ও কম্‌লি আমি চললাম, খাইবি কিছু বাড়ী গেলে অখন, তুই আয়।"

আর পড়ে থাকা চলে না। কম্‌লির চুলের উপর সত্যিই বাড়ীর সবার বড় আকর্ষণ। এই বয়সের মেয়ের পক্ষে বেশ ঘন লম্বা চুল তার, কোমর ছাড়িয়ে পড়ে এখনই। যে সুবিধা পায় সে-ই গোছাটা ধরে টান মেরে বলে, "ধিঙ্গী মেয়ে, কাজকর্ম নাই খালি নৃত্য করতে পার।" যেন তার লম্বা চুলের গোছাটাই ধিঙ্গীত্বে পৌঁছাবার প্রধান নিদর্শন।

ভিজা জামাটা হাত দিয়ে নিংড়াতে নিংড়াতে কম্‌লি চলল চেঁচাতে চেঁচাতে, "ও মাতিদি, দাঁড়া আস্‌ছি, বলিস্‌ না মাকে। ও মাতিদি কাল যে গল্পটা বলেছিলি শেষ করবি না সেটা।" এইবার মাতঙ্গিনী মুখ ফেরাল, "দিনের বেলা গল্প কইলে চোর আসে তাও বুঝি জানস্‌ না তুই।" অবিশ্বাসের হাসি হাসে কমলি, "কি যে বলিস্ তুই দিদি চোর আসতে দেখেছিস কোনদিন না কি? আচ্ছা না হয় রাত্রেই বলিস্‌।"

"আজ রাত্রে জানস্‌ না নষ্টচন্দ্র যে! আজ ত এমনেই আমার জাগতে হইবে, না হলে যে তুই-একটা ফলপাকুড় করছি আর থাকব না। একটা মস্তবড় মানকচু হইছে আমার সমান লম্বা প্রায়, এতকাল রাখছি, আর দুইটা মাস রাখতে পারলেই আড়াইটা ট্যাকা পাই, নাতনীটারে একটা কাপড় কিন্যা দেই।"......ইতিমধ্যে ওরা বাড়ীর গেটে প্রবেশ

করেছে। মাতঙ্গিনী শুকনো জামাটা কম্‌লির হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "নে এটা তাড়াতাড়ি ছাড়, তারপর পিঠে কিছু পড়বার আগেই রান্নাঘরে ঢুক্যা খাইতে বইয়া যা। প্যান্টটা রাইখ্যা দিস্ আমি দিব ধুইয়া।"

ওওরের ভিটার ঘর থেকে শোনা গেল ক্লান্ত কণ্ঠস্বর, "ও মাতঙ্গিনী, কম্‌লি ফিরেছে? না এই লক্ষ্মীছাড়ীর জন্য আমার মরেও সুখ নেই। এতবড় হয়েছে কোথায় নাওয়াখাওয়া শরীরের যত্ন করবে, তা না বেলা এগারোটা বাজে এখনও মেয়ের জলঘাঁটা ঘুচল না।"

তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল হরিদাস। "আপনি অনর্থক চেঁচামেচি করবেন না এখন, আবার শরীরটা খারাপ করবে। কম্‌লি অনেকক্ষণ হল খেতে বসেছে। আমি তাকে ঘুমাতে পাঠিয়ে দেব। তারপর বিকালে আপনি ধরবেন।"

এই মেয়েটির মিষ্টি স্বভাব আর মায়ালাগান মুখখানির জন্য সকলেই তাকে ভালবাসত। চাইত রুগ্না জননী আর রুষ্ট পিতার ক্রোধ থেকে বাঁচাতে। কম্‌লিই মায়ের কাছেপিঠে থাকত বেশী, সামান্য কাজকর্মও করত; পারত না কিছুই, ফলে মায়ের চড়চাপড়টা আর বাবার দুচারটা থাপ্পড় প্রায়ই জুটত অদৃষ্টে। পিঠাপিঠি দাদা আর বোনের ঝগড়া ত প্রায়ই থাকত। কম্‌লির আশ্রয় ছিল রান্নাঘর আর মাতিদির আঁচল। এই মাতিদি আর হরিদাসই তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। মায়ের সেবার ভারী অসুখ করেছিল মরে কি

২

বাঁচে, ফলে হিন্দু রক্ষণশীলপ রিবারের অন্তঃপুরে খ্রীষ্টান মিশনারী নার্সের প্রবেশও অসম্ভব হয়নি। রাজপুরে খ্রীষ্টান মিশনারীরা কাজকর্ম করছিল ভালই। অবশ্য খ্রীষ্টান করতে পারেনি কাউকে। সেদিন সত্যিই সেবা আর শিক্ষা ছিল ওদের মিশন। ফর্সা, গোল-গাল, ভারী এই শিশুটি তাদের মনেও জাগিয়েছিল স্নেহ। ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে অপয়া মেয়ের যে পরিমাণ যত্ন হওয়া সম্ভব তার অনেক বেশী, বলতে গেলে অপ্রত্যাশিত যত্ন জুটেছিল কম্‌লির কপালে। বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদানো হয়েও মিশনারী মেমদের আদরযত্নে স্বাস্থ্য হল কম্‌লির সকলের চেয়ে ভাল। মাসছয়েক পর যখন অন্নপ্রাশনের সময় হল, মা-বাবা, ভাই-বোন অবাক হয়ে দেখল হেলায়-ফেলায় বেড়ে উঠেছে শিশুটি—স্বাস্থ্যে যেন ঝলমল করছে, একমাথা কালো চুল, মনে হল বয়সকালে বাপের নাম রাখবে, রূপসী হবে মেয়েটা, অবশ্য এখনই বলা যায়না কিছু, কিন্তু চোখ-মুখ ভারী সুন্দর হবে। জন্মেছিল শেষ হেমন্তে, কিছুদিন আগে ওরা নৌকা করে বেড়াতে গিয়েছিল, চারদিকে রাশি রাশি পদ্মফুল ফুটে ঝিল আলো করে রেখেছে; কার মনে পড়ে গেল সে কথা, মেয়ের নাম রাখা হল কমলরাণী। এই কমলরাণীই শেষে পরিণত হয়েছে কম্‌লিতে। মাঝে মাঝে নবদুর্গা ভাবেন—আহা! ঐটুকু মেয়ে, কি হবে আমি মরলে, ঘুমন্ত মেয়ের চুলেকপালে হাত বুলিয়ে দেন, নীরবে ঝরে পড়ে অশ্রু মেয়ের মাথা ভিজিয়ে সে জানতেও পারে না। গাঢ় ঘুমে অচেতন, বাজ পড়লেও ভাঙ্গার সম্ভাবনা

নাই, সারাদিনের ক্লান্তি আর দস্যিপনার ক্ষতিপূরণ হওয়া চাই ত। তাই মায়ের কঠোর রুক্ষ চেহারাটাই দেখে কম্‌লি আর পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে তার সান্নিধ্য। ভোরে উঠে ফুল তুলতে যায় পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে, ফিরে এসে পড়তে বসবে, বেলা দশটায় নেয়েখেয়ে স্কুলে যাবে, বিকাল চারটায় ফিরে কোনরকম বইপত্রগুলো মাতিদির জিম্মায় পৌঁছে দিয়ে গোগ্রাসে কিছু গিলেই দে দৌড়! ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই উপস্থিত। কম্‌লি না হলে খেলাটা জমে না। খেলারই কি রকম আছে! কপাটি, হাডুডুডু, ছুটাছুটি মায় ফুটবল পর্যন্ত! ছুটতে পারার জন্য ভারী আদর কম্‌লির। বেঁটেখাটো মেয়েটি, সকলেই তাকে দলে পেতে চায়, বিপক্ষকে পরাজিত করার জন্য কম্‌লির সাহায্য প্রয়োজন। আবার ছেলেমহলেও ফুটবল খেলার খেলোয়াড় কম পড়লে ডাক পড়ে কম্‌লির। সাধারণতঃ মেয়েরা ফুটবল খেলতে যায় না। বাড়ীতে কড়া নিষেধ আছে, কম্‌লির সে বালাই নেই—খানিকটা অনাদর, খানিকটা বঞ্চিতের প্রতি সহানুভূতি বশতঃ কেউ তাকে বিশেষ বারণ করে না। অবশ্য ফুটবল খেলার নামটা অন্তঃপুর অবধি পৌঁছায় না--তাহলে কি হত বলা যায় না। বিকালে রোজই মা বলে দেন, "সন্ধ্যের আগেই বাড়ী ফিরবি।" রোজই 'আচ্ছা' বলে বেরিয়ে যায়, প্রায়ই সে 'আচ্ছা' আর কার্যে পরিণত হয় না। কোনদিন বা মায়ের কাছে চুল বাঁধতে গেলেই উপরি পাওনা জোটে কিছু—কি দস্যি মেয়ে রে বাবা, সারাদিন ছুটবে, চুলে কি জট বেঁধেছে দেখ। রুক্ষ

দুর্বল হাতে মা প্রথমে চেষ্টা করেন ছাড়িয়ে দিতে। হয়রাণ হয়ে ওঠেন রেগে—এমন সুন্দর চুলের গোছা হতভাগা মেয়েটার সেদিকে কি খেয়াল আছে, এরপর আপশোষ করে মরবে—রাগের চোটে জোরে জোরে দেন চিরুণী চালিয়ে মাথায়, ফলে শাস্তিটা মেয়ের যা হয় তার থেকে বেশী হয় মায়ের। গোছা ধরে চুল ছিঁড়ে আসে, কম্‌লি মাকে রাগাবার ভয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে না, তবে তারপর কয়েকদিন মাকে এড়িয়ে তাড়াতাড়ি মাতিদির কাছে চুল বাঁধতে বসে। কিন্তু বেলাবেলি না বসতে পারলে মাতিদিকে পাওয়া যায় না—সে কাপড়জামা পাট করবে, হ্যারিকেন-কুপী সাজাবে, মুছবে, তেল ভরবে, তারপর ঘরদোর ঝাঁটপাট দেবে এই করতে করতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। সন্ধ্যাবেলা দরজায় দরজায় জলছড়াটা দিতে হয় কম্‌লির, মাতিদি শিখিয়ে দিয়েছে। তারপর লক্ষ্মীর আসনের সামনে প্রদীপ ধূনো জ্বেলে উলু দিয়ে তাঁকে আবাহন করতে হয়। এই একটি কাজ কম্‌লির বড় প্রিয়। লক্ষ্মীর আসনের সামনে পরিষ্কার করে মুছে, ঝক্‌ঝকে করে মাজা প্রদীপ পিলসুজে তেলের আলো জ্বালিয়ে পিতলের ধুনুচিতে ধূনোগুগ্‌গুল ধরিয়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করবে। তারপর আর একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে যাবে তুলসীতলায়। গোধূলির আলো ম্লান হয়ে তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে, ডানহাতে প্রদীপটি বাঁহাতে আড়াল দিয়ে ধীরপায়ে কম্‌লি চলেছে তুলসীমঞ্চের দিকে—কে বলবে এই মেয়েটিই এতক্ষণ পায়ে

চাকা লাগিয়ে দস্তিপনা করে বেড়িয়েছে। এ যেন চিরন্তনী বাঙ্গালী বধূ! স্বামী, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নীর কল্যাণ কামনা করে চলেছে দেবমন্দিরে।

চারদিক থেকে হুলুধ্বনির, কোথাও বা শাঁখের শব্দে সন্ধ্যা আবাহন শেষ হয়ে আসে—ঘন আঁধারে মিট্‌মিটে কেরোসিনের আলোয় এবার কম্‌লির গা ছম্‌ছম্ করতে থাকে। ভয়ে ভয়ে গিয়ে মার শোবার ঘরে মেঝেতে হ্যারিকেনটা মায়ের দিক থেকে আড়াল করে পড়তে বসে যায়। ছোট বোন মলি মায়ের কাছে শুয়ে ঘুমায়, মার হয়তো তন্দ্রা আসে। কখনও বা বলেন 'কি পড়ছিস জোরে পড় শুনি।' মায়ের সাধারণ লেখাপড়া ভালই জানা ছিল, হাতের লেখা সুন্দর, তার উপর ছিল অসীম ধৈর্য। এই বয়সে রোগশয্যায় শুয়ে শুয়েও তিনি লেখাপড়ার চর্চা রেখেছিলেন। মাকে শ্রোতা পেলে কম্‌লির উৎসাহ বেড়ে যায়। তাড়াতাড়ি পড়ে চেঁচিয়ে। "জানো মা, মাষ্টারমশাই বলছিলেন আমি এবার ফাষ্ট হব। দিদিমণি বলেছে আমার নাকি অঙ্কে ভয়ানক মাথা! আচ্ছা মা ভয়ানক মাথা কাকে বলে—কই আমার মাথাটা ত ভয়ানক নয়?" মা হয়তো সঙ্গে সঙ্গে হুঁ দিয়ে যান, তাঁর মন চলে যায় দূরে—জানেন তিনি ডাক্তার কবিরাজ বলেছে এখন শুধু যে ক'টা দিন ভগবান বাঁচিয়ে রাখেন। ওষুধের বাইরে এখন তিনি। কোনদিন তিনি এবার চোখ বুজবেন আর ছেলেমেয়ে ক'টা একেবারে নিরাশ্রয় হবে। ছেলেদুটো যাহোক তবু বড় হয়েছে, কোনরকমে

চালিয়ে যাবে, তাদের বাবাও আছেন—কিন্তু মেয়েদুটো নেহাৎই ছোট। কম্‌লি এবার এগারোয় পা দেবে, ধীরে ধীরে মেয়ে বড় হবে। যখন মায়ের প্রয়োজন পড়বে সবথেকে বেশী, তখনই তিনি থাকবেন না। চার ছেলের পর মেয়ে, কত সাধের, কত আশার। বড় মেয়েটি ত কবেই পর হয়ে গিয়েছে স্বামীপুত্র নিয়ে আছে, সংসার করছে, কখনও সখনও আসে, “আহা সুখে থাক্, আমার মত রোগব্যাধি যেন কখনও তাকে স্পর্শ না করে।” কম্‌লিকে মনের মত করে মানুষ করতে পারলেন না তিনি। কাঞ্চনকে সব কাজকর্ম শিখিয়েছিলেন কিন্তু মনের মত করে লেখাপড়া শেখাতে পারেন নি। ইচ্ছা ছিল কম্‌লি যেন লেখাপড়ায় এমন খ্যাতি লাভ করতে পারে যে সকলে একবাক্যে বলে সাক্ষাৎ সরস্বতী! সে আশা প্রায় দুরাশামাত্র এখন। তাঁর অবর্তমানে কম্‌লিকে নিতে হবে মলির ভার। তাই তাকে তিনি অল্প অল্প করে সব কাজ শিখিয়ে দিতে চান। সামান্য কিছু সেলাই, জামা কাপড় কাচা, দরকার হলে কম্‌লি সব চটপট করে দিতে পারে, মাঝে মাঝে প্রশংসাও করতে ইচ্ছা হয় তার। হাতদুটো চলে বড় তাড়াতাড়ি। কিন্তু বড় খেলায় মন। কিই বা করবেন তিনি, এই বয়সে সকলেই অমন থাকে। তাঁর নিজের জীবনের এই সময়টা কেটেছে বধূজীবনের শিক্ষানবিশীতে, শাশুড়ীর তত্ত্বাবধানে; ন’বছর বয়সে বিয়ে হয়ে এসেছিলেন মনটা ছটফট করত একটুখানি খোলা হাওয়ায় বাইরে বার হবার জন্য। সে কথা মনে পড়ে তার আজও,

কিন্তু হতভাগা মেয়ের খেলার ধরণটাই যে আলাদা, মেয়েলী কোন খেলায় কি তার মাথা খোলে না ? সারাক্ষণ বাইরে বাইরে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপিতে থাকলে কি করে সংসারের খুঁটিনাটি কাজই বা শেখান তিনি ! মাতঙ্গিনী, হরিদাস ত যথেষ্ট স্নেহ করে, ওদেরই হাতে ত মানুষ তবে তিনি না থাকলে কি করে সংসারে মানিয়ে চলার শিক্ষা পাবে ? কোথায় কে শুনেছে মেয়েরা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, নদীতে নৌকা দেখলে সেদিকে ছুটে যেতে চায় ! কোথায় পুতুল নিয়ে ঘর সংসার খেলা খেলবে—তা না ধিঙ্গীপনা করে কোথায় গাছে চড়বে, কোথায় ফুটবল খেলবে, কোথায় নদীতে পড়ে সাঁতার কাটবে—কি যে করেন তিনি এই মেয়ে নিয়ে !

তিন

ভোর হয় হয়। সবে একটু একটু করে অন্ধকার দূর হয়ে আলোর আভাস দিতে আরম্ভ করেছে। আকাশের তাড়া খেয়ে অন্ধকারের দুরন্ত শিশুরা আশ্রয় নিয়েছে ঘরের কোণে আনাচে কানাচে। মুসলমানপাড়ায় মুরগীর ডাক এখনও শোনা যায় নি। কাকের কা-কা রবে কান ঝালা-পালা হবার সময় হয়নি এখনও। বাদুড়গুলি একটি দুটি করে ঝুলতে আরম্ভ করেছে বড় গাব গাছটার ঘন পাতার আড়ালে। গাছে গাছে পাখীদের কলরব শুরু হ'বার সময় হল। মমতাময়ী উষার স্নিগ্ধ হাওয়ার প্রলেপ লেগে ঘুমের ঘোর জড়িয়ে আসছিল চোখে কিন্তু সবেগে তাকে ঝেড়ে ফেলে বিছানার উপর উঠে বসল কমল, মল্লিকা, সমীর, শিশির চোখ রগড়াতে রগড়াতে। এখনই ওদের রওনা হতে হবে। তাড়াতাড়ি মুখ ধোয়ার পর্ব শেষ হল। পুরনো চাকর হরিদাস চা ও খাবার তৈরী করে রেখেছে। ছেলেমেয়ের দল ত অবাক। যে হরিদা বেলা ৬টার আগে কিছুতে ঘুম থেকে উঠে না বাবার দুচারটা কিলচড় না খেলে, সেও কি না আজ রাত তিনটা থেকে খাবার তৈরী করা শুরু করেছে। যা হোক অবাক হবার আর সময় নাই। কমল তার জামা আর প্যান্ট এর খোঁজে সারাবাড়ী তোলপাড় করতে লাগল, "এই ছোড়দা, তুই নিশ্চয় লুকিয়েছিস, দে বলছি শীগগির, ও মা আমার

জামাটা ছোড়দা লুকিয়ে রেখেছে দিচ্ছে না··" স্বর ক্রমশঃ চড়বার উপক্রম করতেই এক ধমক লাগাল সমীর, "থাম বলছি আহ্লাদী মেয়ে, তোর জামাটা কি আমি গায় দেব তাই লুকিয়েছি? কোথায় রেখেছিস তার খোঁজ নেই এদিকে আমাকে মার খাওয়াবার মতলব। আমি ব'লে আমার লাটাই ঘুড়ি খুঁজে পাচ্ছি না—তুই নিশ্চয় তোর পুতুলের ন্যাকড়া বাঁধতে আমার সূতো নিয়েছিস।"

"ওমা কি মিথ্যেবাদী আমি আবার তোর সূতো নিলাম কখন? দেখছিস মেজদা ছোড়দা সেধে ঝগড়া করছে—এই মলি, এটা আবার কি হচ্ছে—আমার এই পুতুলটা তোর হাতে কি করে এল—"

মলি চেঁচিয়ে উঠল, 'ও বাবা ছাখ মণিদি আমার পুতুলটা দিচ্ছে না "

যথাসম্ভব জোরে ফিস্‌ফিস্ করে শিশির জানাল, "আরে এই এত চেঁচাচ্ছিস যে, বাবা আসছে দেখতে পাচ্ছিস—"

সব একেবারে চুপ—মলি, কম্‌লি, শিশির, সমীর সব একেবারে লক্ষ্মীছেলের মত চুপ করে রইল যেন সবাই নিতান্ত ভালমানুষ ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। একটু আগে তুমুল কলহের রেশ তখনও ঘর থেকে মিলিয়ে যায় নি। লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় দেবীপ্রসাদের বিলম্বিত দীর্ঘ ছায়াটা পড়ল সাদা দেয়ালে, ভয়ে সকলের বুক কেঁপে উঠল, কি হয় কে জানে। খড়ম খট্‌খট্ করতে করতে দেবীপ্রসাদ এসে ঢুকলেন ঘরে, "কি রে তোরা এখনও তৈরী হলি না এর পরে

সূর্য উঠে গেলে কি আর বেরোন যাবে? নে তাড়াতাড়ি কর।"

তবুও কেমন যেন সকলেই চুপ করে আছে। এইবার পড়ল বুঝি পিঠে। সবচেয়ে সাহসী ছিল মলি, বাবার আদুরে কি না! বলে ফেলল, 'বাবা, মণিদির জামা লুকিয়েছে ছোড়দা, আর ছোড়দার লাটাই লুকিয়ে রেখেছে মণিদি না কে জানে…।

'এই রে সেরেছে' ভাবে সবাই। এই আহ্লাদী মেয়েটাই খেল এবার—কিন্তু সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল দেখে যে বাবা তেড়ে ত উঠলেনই না বরং একটু যেন হেসে বললেন, "কিছুই হারায় নি লুকায়ও নি কেউ, সবই তোদের মা নিয়ে যাচ্ছেন, দেশে গিয়ে দাদা দিদিদের সব সম্পত্তি দেখাতে হবে ত?"

সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সবাই স্থান কাল পাত্র ভুলে—'কি মজা'।

তাড়া দিয়ে উঠলেন দেবীবাবু, 'ফের চেঁচাচ্ছিস, যা শীগগির নৌকায় গিয়ে ওঠ।"

সারি দিয়ে চলল সবাই নদীর ঘাটে। চন্দনীর জল তখনও লাল হয়ে ওঠে নি। শীতল হাওয়ার পরশে নৌকা দুলছে অল্প অল্প। প্রথমে ছোটরা গিয়ে দাঁড়াতেই মাঝি দুজন দাঁড়াল নৌকার দু'পাশে, মলি আর কম্‌লির দু'হাত দুজনে ধরে চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে দিল নৌকার ছইয়ের ভিতরে। সমীর আর শিশিরের হাত ধরতে যেতেই তারা লাফ দিয়ে ঢুকে গেল। নৌকাটা দুলে উঠল সজোরে—কম্‌লি চেঁচিয়ে

উঠল, 'ও মা ছোড়দা নৌকাটা ডুবিয়ে দিচ্ছে দেখ।" পাড়ে ছিলেন দেবীপ্রসাদ, নবদুর্গা, হরিদাস আর ছোকরা চাকর কেষ্ট। হরিদাস ধমক দিয়ে উঠল, "নে আর নালিশ করতে হবে না, উঠতে না উঠতেই ঝগড়া, পারেও এত।" তাকে সমর্থন করে বললেন দেবীপ্রসাদ, "দিনের দিন ছেলেগুলো যা হয়ে উঠেছে, দুষ্টের শিরোমণি, কেন রে বাপু নৌকায় উঠেছিস তা একটু চুপ করে থাক, তাই কি দুদণ্ড শান্তি আছে?"

ভয়ের চোটে বেচারাদের ত প্রায় নাড়ী ছাড়ে আর কি! কি জানি বাবা যদি নাবিয়েই দেয়! কাল আবার মা বলেছে যে যারা শয়তানি করবে তাদের রাস্তায় নীলপুরের গঞ্জে নামিয়ে রেখে যাবে।

ততক্ষণে নৌকা তর্‌তর্‌ করে ভেসে চলেছে নদী বেয়ে। তারা এসে পড়ল খালের মুখে। খালের দু'পাড়ে নাম না জানা গাছে বড় বড় কি জানি ফলে আছে। মাঝে মাঝে একটা দুটো ফল পড়ছে জলে সেগুলো আবার না ডুবে ভেসে আছে, রসগোল্লার মত আর্ধেকটা তার জলের উপরে। মলি চেঁচিয়ে উঠল, "ওমা দেখ রসগোল্লার গাছ।" সকলেই একটু হাসল প্রসন্নভাবে। জ'লো হাওয়ায় ছুটির আনন্দে সকলেই প্রসন্নভাবে সবকিছুই গ্রহণ করছে। দুদিকে বাঁশের ঝোপ, নুয়ে পড়েছে কিছু ডগা জলের উপরে। বাঁদিক থেকে নবোদিত ভাস্করের রক্তিম কিরণ উঁকি মারছে বাঁশ ঝোপের ভিতর দিয়ে, তার ছটা এসে পড়েছে মলি কম্‌লির কচি মুখে। উৎসাহে, আনন্দে আর প্রত্যুষের প্রসন্নতায়

ধুয়ে মুছে গিয়েছে যত কলহের রেশ, আর না পাওয়ার বেদনা।

মাঝে মাঝে খালের মুখ এত সরু যে নৌকা প্রায় পাড়ে লাগে আর কি? বাঁশে ঠেলা দিয়ে, পাড়ে ধাক্কা দিয়ে চলল ওরা। খালের পাড়ে পাড়ে যাদের বাড়ী তাদের বৌ-ঝিরা কপালের কাপড় একটু সরিয়ে দেখছে—'ওমা এতবড় মেয়ে শাড়ী পরেনি কেন?' ভয়ে বিস্ময়ে তারা ঘোমটা টেনে দিতেও ভুলে গিয়েছে, ডাগর ডাগর চোখদুটি মেলে তাকিয়ে আছে কম্‌লি, মলির দিকে। কম্‌লি, মলি, শিশির, সমীর চেঁচাচ্ছে, "ও মা কতটুকু বউ দেখ? আবার গায়ে কি পরেছে—রূপার বালা বুঝি! আচ্ছা ওদের গায়ে লাগে না?" শিশিরের কিছু বয়স হয়েছে, বলল "ত্থাখ ওদের কি মজা! জলের উপরই বাড়ী যখন ইচ্ছা নৌকাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল।"

বাবা বললেন, "কিন্তু যাবে কোথায় ওরা। ওদের কি আর একটা দেশ আছে? এইখানেই ওদের বাড়ী। এই খালেবিলেই মাছ ধরে ওরা খায়, কেউ বা হাটে বিক্রী করতে যায়। ওদের মেয়েরা শাকপাতা তোলে, ছেলেরা চাষ করে, কি দরকার ওদের সহরে যাবার? বেশ সুখে আছে—"

সমীর বলে উঠল, "কিন্তু ওরা ত আমাদের মত বেড়াতে পায় না।"

মলি বলল, "ওদের কি মজা, ইস্কুল যেতে হয় না।"

কম্‌লি বলে উঠল গম্ভীর চালে, "তাহলে কত কিছু ওরা জানতেও পায় না।"

শিশির সবকিছু ভুলে চেঁচিয়ে উঠল, "নাই বা জানল, ওদের ত মোটামোটা বই পড়তে হয় না। এই বইগুলো যারা লিখেছিল তাদের পেলে একবার দেখে নিতাম।"

পিছন থেকে বলল হরিদা, "এখন যে সুযোগ পাচ্ছ তার মানে ত বুঝতে পারছ না। মনে হচ্ছে যারা পড়ে না তারা কত সুখী, আর একটু বড় হও তখন বুঝবে।"

মলি বলল, "কক্ষণো না, আমি বড় হলে মাঝি হব, খালি নৌকা বাইব আর দেশে যাব।" সবাই হেসে উঠল।

ইতিমধ্যে নৌকা এসে পড়েছে হাওরের মুখে—দিগন্ত বিস্তৃত হাওর—যেদিকে তাকাও খালি জল আর জল, পৃথিবীটা যেন মুছে গিয়েছে চোখের সামনে থেকে ; তার বদলে যেটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছে সেটা গোলাকার সমুদ্র। কে যেন বলেছিল পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল—তারা কোনদিন হাওরের মধ্যে নৌকা নিয়ে ভাসেনি, তাহলে বলত পৃথিবীতে শুধুই জল আর কয়েকখানি নৌকা মাত্র আছে। সেই নৌকা চলবার সময় কলকল করে আওয়াজ হয় ; সে আওয়াজ শুনে নেচে ওঠে বক্ষের রক্ত তালে তালে। ইচ্ছা হয় ঐ কলকল ধ্বনির সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি ঐ প্রাণোচ্ছল জীবন তরঙ্গে। হালকা হাওয়ায় হাওরের বুকে জেগে ওঠে খুসীর তরঙ্গ—মৃদুমধুর তার ছন্দ—হাত ধরাধরি করে তারা ডাকে প্রকৃতির সন্তানকে। দূরে হাওরের সীমানা যেখানে হাত বাড়িয়ে ডাকছে আকাশের নিবিড় নীলিমাকে সেখানে তাল, নারিকেল, সুপারীর ঘনসবুজ মাথায় পাওয়া যায়

মাটি মায়ের পরশ। পূর্ণিমা রাতে, শুক্লাতিথিতে যখন আকাশ ভুবন প্লাবিত হয়ে যায় জ্যোৎস্নাধারায়, নির্মল হাওরের জল উচ্ছল হয়ে ওঠে, যেন মিশতে চায় ঐ দূরবাসিনী স্বর্ণ-কিরণের সঙ্গে। বিশ্ব সংসার-সমাজ সবই তখন হয়ে যায় তুচ্ছ। এমন কি মানুষের সহজাত যে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি আত্মরক্ষা, তাও হয়ে যায় শিথিল—মাঝিরা তাদের সবল বাহু থেকে আল্‌গা করে দেয় দাঁড় বৈঠা; মনের আনন্দে, পরিবেশের প্রভাবে তাদের কণ্ঠে ফুটে ওঠে সংগীত। ভগ্ন স্বপ্ন নির্ঝরের মত সে সংগীতধারা ছড়িয়ে পড়ে চরাচরব্যাপে, সৃষ্টি হয় ভাটিয়ালীর। নির্মল জ্যোৎস্না, দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি, নেচে ওঠা তরঙ্গের কলকল শব্দ, তারই পটভূমিকায় বলিষ্ঠ কণ্ঠের উদাত্ত সঙ্গীত, যে একবার শুনেছে, জীবনে সে তা আর ভুলতে পারেনি। নীরব মুহূর্তে, ক্লান্ত মনের উপর ছায়া ফেলে তারা।

'Often in my couch I lie
In vacant or in pensive mood
They come upon my inward eye
Which is the bliss of solitude.'

এই হাওর জড়িয়ে কত গল্প, কত কাহিনী, কত অত্যাচার দস্যুতার কথা ছড়িয়ে আছে পূর্ববাংলার আশেপাশে আনাচে কানাচে কে তার হিসাব রাখে। শুধু কেনারাম, বংশীবদন, চন্দ্রাবতী, বিশে ডাকাত আর ময়নামতীই নয়, কত লীলাবতী, কঙ্ক, মহুয়া, কত বেহুলার চোখের জল এসে মিশেছে পূর্ববঙ্গের

হাওরের বুকে কে রাখে তার হিসাব! কোন্‌দিকে কোন্‌ পথ দিয়ে বেহুলা গিয়েছিল মৃত স্বামীর অস্থিক'খানা বুকে করে স্বর্গপুরে—কোথায় এসে লেগেছিল জয়চাঁদের নৌকা—কোন্‌ খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল কাঞ্চনমালা—এক প্রশ্নেই তার জবাব দিয়ে দেবে নিপুণ মাঝি। তারই সঙ্গে শোনা যাবে ভরাবর্ষায় কালিদহের জলে নৌকাডুবির কথা—তারপর যাঁরা রাতে পথ দেখাবার নাম করে নৌকাকে নৌকা ভুলিয়ে নিয়ে যান, কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ দেখলে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় পথ ঠাহর হচ্ছে না, বারে বারে ঘুরে ফিরে একই জায়গায় এসে পড়ছ—রাত ক্রমশঃ গভীর হয়ে আসছে—অতিবড় পাকা মাঝির বুকও তখন কেঁপে ওঠে, যায় বুঝি যাত্রীসমেত নাওখানা তলিয়ে; যদি বুদ্ধিভ্রংশ না হয় সে বিপদে—লগি পুঁতে অবশিষ্ট রাতটুকু কাটিয়ে দেবে সে জলেরই উপরে। হয়তো পৌঁছতে একটু দেরী হবে, কুলকিনারাবিহীন সাগর দেখে যাত্রীরা ভয়ও পাবে খানিকটা—হয়ত বা বকাবকিই করবে কিছুটা, কিন্তু নিপুণ কর্ণধার সে তিরস্কারে কান দেবে না, কারণ এ সময়ে মাথা গরম করা মানে সেই তাঁদেরই হাতে সমর্পণ করা তার যাত্রীদের—সে না এদের দায়িত্ব—এদের জান মানের দায়িত্ব নিয়ে নাও হাতে নিয়েছে? যাত্রীদের কথায় ক্ষেপে উঠে যদি লগি তুলে নাও আবার ছেড়েই দেয় ক্ষতিটা যে হবে যাত্রীর! মাঝি তাই বোবাকালার ভান করে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লেগে যাবে লগিতে ভর দিয়ে। পরদিন ভোর না হতেই—পাখ্‌ পাখালীর ডাক না ফুটতেই যখন

চোখের দিশারা ভাব কেটে যাবে তখনই মাঝি হাতে তুলে নেবে বৈঠা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আল্লার নাম নিয়ে ভাসাবে নাও আবার, কণ্ঠে জেগে উঠবে তখন কোন্ বিরহী বঁধুর মর্মব্যথা—

তোমার নি পরাণরে মাঝি হরিয়াছে কেউ
ওরে সাঝেঁর পিদ্দিম ভাসাইয়া জলে
গোণে গাঙের ঢেউ

স্রোতের লক্ষণটা ভাল ঠেকছে না—শিশিরদের নৌকাটা কূলের কাছ দিয়ে চলল। ইতিমধ্যে মাঝিদের উনান চেয়ে নিয়ে এক প্রস্থ চা-পর্ব সারা হয়েছে। হরিদা পাকা রাঁধুনী, সঙ্গে নিয়ে এসেছে চাল, ডাল, তেল আর নুন। জলের ত অভাব নেই,—হাতটা বাড়ালেই হল,—ডেক্‌চি, হাঁড়ি ডুবিয়ে এনে উনানে বসিয়ে দাও। "তাই বলে মনেও কোরো না, শুধু ডাল ভাত খাব আমরা" শিশির বলে দিল মাঝিকে।

মাঝি অজ্ঞতার ভাণ করল, "তাহইলে কর্তা, কি খাওন যাইব এই জলের মধ্যে।"

"দেখ, হরিদা কেমন মাছ ধরে আনে 'খরা' থেকে।"

কমলি চেঁচিয়ে উঠল "'খরা' আবার কেমন থাকে রে ছোড়দা ?"

হাওরের মুখে যেখানে খাল বা নদী বার হয়েছে সেখানে বড় বড় জাল পেতে বসে থাকে জেলেরা—অনেক সময় একটু কম জল যেখানটায় সেখানেও থাকে—ভোর রাত্রে কখনও বা সন্ধ্যারাতে এসে জাল পেতে সারারাত ধরে পাশের

নাওখানায় শুয়ে পাহারা দেবার ভাণ করে। ঠাণ্ডা জোলো হাওয়ায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পৈতৃক চাদরখানা বেশ করে গায়ে জড়িয়ে তেলচিটে বালিশে মাথা দিয়ে প্রবলবিক্রমে পাহারা দেবার কাজ শুরু করে। হাওরের বুকের কালো জল যখন দিবসের আভাস পেয়ে নূপুর পরা বালিকার মত ছুটে চলে নদীর দিকে, সেই আলো আঁধারে দিশাহারা হয়ে মাছের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে জালের বুকে, পালানোর পথ বন্ধ হয়ে যায় চিরদিনের মত, বৃথাই তারা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছটফট করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেয়ের। জেলে তখন তার গাঢ় হয়ে আসা ঘুমের আমেজ ঝেড়ে ফেলে উঠে বসে নৌকার গলুইয়ের উপর, আড়ামোড়া ভেঙ্গে চাপ দেয় পায়ের নীচে আটকানো বাঁশে, চারখানা ধনুক দিয়ে আটকানো জাল উঠে আসে জল ছেড়ে—আরো জোরে চাপ পেলে গোটা জালের মাছ এসে জড় হয় পায়ের কাছে জালের গায়ে। মাছের সমারোহ দেখে ঘুম-পাড়ানী মাসীপিসিরা হাওরের চতুঃসীমানা ছেড়ে পালাতে পথ পান না। সে কি মাছের চেহারা! সোনালী, রূপালী, কই, খল্‌সা, পুঁটি, ট্যাংরা, চাঁদা, টাকা, বাঙনা-এলং, বাচা সিলোন, চাপিলা, খয়রা, ইচা কত আর নাম করা যায়, সেসব মাছ অনেক সহরের লোক চোখেই দেখেন নি ; যদি বা কিছু দেখে থাকেন, বরফে, রেলে, ষ্টীমারে, মানুষের হাতে তার সে চেহারা আর চেনার উপায় থাকে না।

চার আনার মাছ কেনা হল খরা থেকে। সমস্বরে চেঁচামেচি পড়ে গেল নৌকায়। ‘ওমা কি সুন্দর মাছ!’ ‘কি

চক্ চক্ করছে দেখ,'—'আহা ওদের কেটে ফেলবে নাকি ?' ধমক দিল হরিদা, "থাম দেখি সব, না কাটলে খাবি কি শুনি ? এই কেষ্ট শীগগির মশলাটা বেটে দে না - ছেলেগুলা যে ক্ষিদেয় শুকিয়ে গেল !"

দেবীবাবু বললেন, "দাঁড়া অত তাড়া করিস না। এই নীলপুরের গঞ্জে নাও লাগিয়ে কিছু জিলাপী আর চিঁড়া কিনে নে। তোদের রান্না হতে এখনও অনেক দেরী। আমারই ক্ষিদে পেয়ে গেল ত ওদের !"

এতক্ষণে মুখ খুললেন নবদুর্গা, "সেইসঙ্গে কিছু চিনির বাতাসা আর প্যাঁড়া নিয়ে আসিস—আর ছাখত নারকেলের নাও এসেছে কি না। ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু নেওয়া হয়নি।"

খানিক ডাকাডাকি হাঁকাহাকি করতেই এক টাকার নারকেল কিনে ফেলল কেষ্ট, ষোলজোড়া নারকেল বেশ বড়-ই—ব্যাপারীদের নাও থেকে। দেশ বিদেশের ব্যাপারীরা এই গঞ্জে আসে জলের দিনে তাদের নৌকা নিয়ে। বিরাট বিরাট নৌকা, মাথায় ঢেউ টিনএর ছাদ আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত মালে ঠাসা—পাট, নারিকেল, চাল সুপারী আরও কত কি ? মাস্তুলের কাঠের সঙ্গে একটা নারিকেল বা একগাঁট পাট বাঁধা—দূর থেকে বুঝতে যাতে অসুবিধা না হয়। গঞ্জে গঞ্জে ফেরে তারা মাল নিয়ে, কখনও পাইকার গোটা মালটাই কিনে নেয়, কখনও বা খুচরা বিক্রীও হয়। ব্যবসার আর এক নাম ব্যাপার, তাই এদের বলে ব্যাপারীর নাও।

এই নৌকার একমাত্র তুলনা চলে বড় বড় দূরগামী ষ্টীমারের সঙ্গে। দেশে বিদেশে, গাঁয়ে গঞ্জে, সাগরে হাওরে তাদের অবাধ গতি। মাঝি মাল্লাদের এটাই বাড়ীঘর এই তাদের নাতিপুতি। ব্যাপারীর নাও এর মাঝি, মাঝি সম্প্রদায়ে কুলীন, মধ্যবিত্তের ঈর্ষার পাত্র।

কর্তা মন্তব্য করলেন, "ব্যাটারা একেবারে ডাকাত, এক টাকার নারিকেল কিনা মোটে ষোলজোড়া—আমরা যে বিশ বাইশ জোড়া কিনেছি হরদম। টাকাটা উপায় করতে যেন আর পরিশ্রম করতে হয় না!" কেষ্ট আর হরি মিলে নিয়ে এল আউসের চিঁড়া আর পদ্মপাতায় জিলাপী। নবদুর্গা ধোয়া গামছায় চিঁড়া বেঁধে নিয়ে হরিকে বললেন, "মাঝিকে বল নাওটা একটু মাঝ হাওরে নিয়ে যাক, চিঁড়া ধুয়ে খেতে দেই ছেলেদের।" মাঝিদের সঙ্গে কথা বলবেন না তিনি, সম্ভ্রান্ত পরিবারের বধূ তিনি যার তার সঙ্গে কথা বলা রীতি বিরুদ্ধ। দেবীপ্রসাদের হুকুমে নৌকা চলল আবার, খানিক দূরে গিয়ে পরিষ্কার জল পাওয়া গেল, লগি পুঁতে নৌকা খাড়া করা হল। চিঁড়া আর গরম জিলাপী পদ্মপাতার উপর রেখে গরম চা সহযোগে সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে তার—, হঠাৎ ছেলে-মেয়েদের নজরে পড়ল খানিকদূরে গোলাপী কতগুলো ফুলের দিকে, সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল তারা, "ও মাঝি নিয়ে চলনা নাওটা একটুখানি, আমরা ঐ ফুল নেব।" অনুমতির জন্য তাকাল দেবীবাবুর মুখের দিকে, আজ তারা দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে বাবার দিকে কখনও অনুমোদনের আশায় তাকিয়েছে

বলে মনে পড়ে না। দেবীবাবুও আজ উদার, অনন্ত আকাশের নিবিড় নীলিমা, নৃত্যমুখর ঊর্মিমালাসজ্জিত বিস্তৃত জলরাশি তাকেও দিয়েছে প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ, তুলে আছাড় দেওয়ার বদলে তিনি আজ ছোলাভাজাই দিলেন। মাঝিকে হুকুম দিলেন, "নে রে বৈঠাটা তুলে—দে ছেলেগুলোকে কয়েকটা ফুল।" একরাশ পদ্ম আর শালুক জড় হল নৌকার পাটাতনের উপর। ছেলের দল উচ্ছ্বসিত আনন্দে হৈ হৈ করে আবার অন্যদিকে হাত বাড়াতেই এবার ধমক দিয়ে উঠল হরিদাস, "জঞ্জাল জড় করছিস্ যে, এগুলো ত এক্ষুণি শুকিয়ে উঠবে।"

সস্নেহে হেসে বললেন নবদুর্গা, "কতগুলো শাপলার ডাঁটা মাছের ঝালে দিস—আর বাকীগুলো আয় তোদের মালা করতে শিখিয়ে দিই।" মলি, কম্‌লি, শিশির, সমীর কলকণ্ঠে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল,—কি মজা! মলির চুলে মাথায় কিছু পদ্ম বেঁধে দিলেন মা—কম্‌লি কিছু শালুকের মালা গেঁথে পরল গলায়। একটু শিউরে উঠল ঠাণ্ডা মৃণালের ছোঁয়ায় কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে গেল শীগগিরই। সামনে বসে ওরা তাকিয়ে রইল আশেপাশে আরও কিছু পাওয়া যায় কি না উল্লেখযোগ্য। নবদুর্গা ছইয়ের ভিতর থেকে ডাক দিলেন মলিকে, "বলত ওটা কি ডুব দিল? ঐ যে—"

"ওটা মাছরাঙা, না মা?"

"দূর বোকা! ওটা পিপি!"

"পিপি কি মা?"

"পিপি হল পানকৌড়ির চলতি নাম।"

ইতিমধ্যে হরিদা রান্নার পাট সেরে এনেছে। দেবী-প্রসাদকে ডেকে বলল, "রান্না ত হয়ে এল, এবার স্নানটান করুন।"

মাঝি টলটলে জলের উপর এনে নৌকাটা রাখল। বিরাট লগির সঙ্গে বাঁধল কষে। এক এক করে ঝাঁপ দিল জলে সমীর, শিশির, কেষ্ট, দেখাদেখি ঝাঁপ দিল সবশেষে কম্‌লি। দেবীপ্রসাদ চমকে উঠলেন, "এই কম্‌লি মরে যাবি যে, তুই সাঁতার জানিস না, কিছু না আর ওদের দেখাদেখি তুইও লাফ দিতে গেলি? হায়, হায়, এই হরি নাম্ না হয় তুইই।"

জোরে হেসে উঠবার মত তুঃসাহস কারোরই ছিল না, মৃত্বস্বরে নবতুর্গা বলে উঠলেন, "ও সাঁতার কাটতে শিখেছে।"

দেবীপ্রসাদ সচমকে বললেন, "কবে শিখল, কার কাছে শিখল, কই আমিত কিছুই জানি না।"

হরিদাস বলল, "আপনি কি আর সব খবরই রাখেন? ছেলেপুলে কে কোথায় কি করছে তার অত হদিস করার সময় কোথায়? কম্‌লি যা সাঁতার শিখেছে আমাদের পাড়ার কোন মেয়ে অমন সাঁতার দিতে পারে না - ঐ দেখুন না - " ততক্ষণে কমল চীৎসাঁতারে সমীরদের সঙ্গে প্রায় তাল রাখে রাখে। পিছন থেকে মলি হাততালি দিয়ে উঠল, "ছি ছি, ছোড়দা, তুই হেরে যাচ্ছিস।" হাঁক দিয়ে উঠলেন দেবীপ্রসাদ, "ওরে তোরা বেশীদূর যাস না, কোথায় কোন্ টানের মধ্যে পড়ে যাবি তখন আর খোঁজ পাওয়া যাবে না।" কে শোনে কার

কথা ? প্রথম প্রথম খানিকটা ভয় ছিল অপরিচিত জায়গা, অপরিচিত জলের স্রোত, কিন্তু তেমনি আবার বাবা-মাকে দেখিয়ে বাহাত্বরী নেবার আগ্রহটাও প্রচুর।

এই ছেলেমেয়ের দল প্রাত্যহিক জীবনে বড় একটা পিতামাতার সান্নিধ্য পায় না, সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। মা থাকেন হাঁড়ি হেঁশেল আর রোগশয্যা নিয়ে— তু'দিন ভাল থাকেন ত তিনদিন বিছানায়, যে কদিন সুস্থ থাকেন রকমারি কাজের অভাব হয় না তার। বাবা থাকেন অফিস আদালত উকিল মোক্তার মক্কেল হাকিম নিয়ে—ছেলেমেয়েরা যে যার খানিকটা পড়াশোনার নাম করে হড়বড় করে চেঁচিয়ে সময় হলেই স্নান খাওয়াটা সেরে ছুট দেয় স্কুলে। বিকাল বেলা বাড়ী ফিরে আবার খাওয়া দাওয়ার পর খেলার ধূম। সন্ধ্যা হতে না হতে বাড়ী ফিরে ঢুলতে ঢুলতে আবার খানিকটা পড়ার অভিনয়, তারপর বাবার ডাকে খেতে বসা, সে সময় ঠোঁট নাড়ে কার সাধ্যি! বাস্, এই ত সারাদিনের রুটিন। ছুটিছাটায় যদি বা বাবা মা খানিকটা অবসর থাকেন, নিজেদের আত্মীয়স্বজন অথবা সামাজিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয় ছেলেমেয়ের পিছনে ব্যয় করার মত অফুরন্ত অবসর নেই তাদের। পড়তে বসা, স্কুলের মাইনা, বইপত্র, পরীক্ষার ফল এদের উপর কড়া নজর রাখতে অবশ্য ভুল হয় না, তবে বাকী সময়টা ছেলেমেয়েরা স্বাধীন। বড়দের জগৎ আলাদা, ছোটদের জগৎ তাদের গণ্ডীর বাইরে পা বার করে বড়দের পৃথিবীতে অনধিকার প্রবেশ করে না। আজ

সমস্ত সমাজ এবং সংসারটা সীমাবদ্ধ হয়েছে ছোট একটা নৌকায়, তার উপর প্রকৃতির নিবিড় প্রশান্তি, প্রশস্ত জলধারার বিস্তীর্ণ উদারতা, তাদেরও করেছে স্নেহময়-মোহময়। নিমেষের জন্য দেবীপ্রসাদের মনে উঁকি দিয়ে গেল একটি চিন্তা, 'কমলি তাহলে সাবালক হয়েছে জল আর আগুনে আর তার ভয় নেই।' পরক্ষণেই সন্তান স্নেহ এসে নাড়া দিল মনকে—উন্মনা ভাবটা কাটিয়ে তিনিও নেমে পড়লেন জলে। দীর্ঘ সাড়ে ছ'ফুট লম্বা দেহ, জল উঠল তাঁর গলা অবধি। হরি বিস্মিত হয়ে রইল। নবদুর্গার মুখে ফুটে উঠল স্মিত হাসি। ছেলে মেয়েরা বাবাকে দূর থেকে জলে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সাঁতরে এল নৌকার কাছাকাছি। নাওএর গলুইএ হাত রেখে ভাসতে লাগল তারা, বাবা এবার চুবিয়ে মারবেন ঠিক। ভয়ে ভয়ে তারা জল ছেড়ে ওঠার উপক্রম করতেই দেবী-প্রসাদ বললেন, "আয় আমার সঙ্গে সাঁতরে কে পারিস দেখি।" ওদের বিস্ময়ের সীমা রইল না আর, "একি বাবা তাহলে সাঁতার কাটতে পারেন?" পরমুহূর্তেই তিনজনেই কলরব করে উঠল সমস্বরে, "আমি যাব, আমি যাব।"

খানিকক্ষণ পরের কথা, সূর্য তখন প্রায় পশ্চিমসীমান্তে ঢলে পড়েছে—হাওরের জলে এসে পড়েছে অস্তরবির শেষ কিরণ। ঢেউয়ের দল শুরু করেছে সেদিনের শেষ হোলিখেলা। সে আবীরের রঙে, ক্রমঅগ্রসরমান তটে কলহমত্ত হংস-বলাকার রকমারি পালকের রঙে, মাথার উপর দিয়ে উড়ে

যাওয়া কুলায়প্রত্যাশী পাখিদের ভীড়ে চারদিকে সৃষ্টি হয়েছে এক মোহময় পরিবেশ, দিবসের বিদায় সম্ভাবনায় সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত, সকলেই অন্তর দিয়ে উপভোগ করছে এই নীরবতাটুকু।

ধীরে ধীরে হাওরের সীমানা ছাড়িয়ে নৌকা এসে পড়ল খালের মুখে আবার। দেবীপ্রসাদ মাঝিকে বললেন, "ওরে নাওটা একটু লাগিয়ে রাখ—অন্ধকারটা হোক তারপর বাড়ীর ঘাটে গিয়ে লাগাবি।" স্ত্রীকে নিয়ে তিনি রাতের আগে বাড়ী ঢুকতে পারবেন না—সেটা নিয়ম নয়। যাঁরা আছেন তাঁরা কেউ মুখে কিছু বলবেন না, কিন্তু সামাজিক আচার ব্যবহার বাদ দিয়ে সমাজে বাস করা চলে না। চিরকাল ধরে দেখছেন বাড়ীর বৌঝিরা সদর অন্দরের ব্যবধান আর আব্রু বাঁচিয়ে চলে। যার যেখানে জায়গা ঠিক করা আছে তার সীমানা লঙ্ঘন করেনা কেউ। তিনি অবশ্য এখান থেকেই ইচ্ছা করলে হেঁটে চলে যেতে পারেন কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোকে একা ফেলে আজ আর এগিয়ে যেতে মন সরছে না। তার চেয়ে একটু আবছা অন্ধকারে একসঙ্গে যাওয়াই ভাল।

চার

কয়দিন কেটে গেল মহা হৈ চৈ করে। ছেলেরা মিশে গেল খুড়তুত জ্যাঠতুত ভাই, পাড়ার ছেলে সকলকার সঙ্গে, মেয়েরা মিশে গেল মেয়েদের দলে। ছেলেরা ত ইতিমধ্যে দাদাদের সাহায্যে একখানা নাও নিয়ে মাছ ধরে নিয়ে এল। একদিন আবার গেল বন্দুক নিয়ে শিকার করতে, সেদিন অবশ্য নেতৃত্বটা ছিল দেবীপ্রসাদের। এতগুলো চিত্তাকর্ষক অভিযানে অংশ নিতে না পেরে কিন্তু কম্‌লির মনে মোটেই দুঃখ হয়নি। তাদের দলও বড় কম যায় না। এর মধ্যেই কোন্ গাছের বাতাবিলেবু বেশী পেকেছে, কোন্ বাঁশঝোপের তলায় নতুন কোঁড় গজিয়েছে, কার গাইয়ের নতুন বাচ্চা হয়েছে সব তারা আবিষ্কার করে ফেলেছে। এই অভিযানের নেতৃত্ব হল রাঙাদির, বড় তরফের মেয়ে সরমার। বছর তেরো-চৌদ্দ হবে তার বয়স, পাড়াগাঁয়ে মা জ্যেঠির সঙ্গে কারবার তার, সাংসারিক বুদ্ধি আর কাজেকর্মে বেশ পাকা হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। সাধারণ সেলাইফোঁড়াই ভালই পারে, তার উপর চিঁড়া কোটা, ধান ভানা এসব কাজেও এরি মধ্যে হাত লাগাতে আরম্ভ করেছে। ফলে অতি সহজেই দলের নেত্রীর পদটা এসে গিয়েছে তার হাতে। তিন বছরের ছোট কম্‌লিকে সে মনে করে একেবারে ছেলেমানুষ ; পাশের বাড়ীর নিরু তারই বয়সী হলেও সে প্রজার মেয়ে তাই

নিরুকে সে সহজেই হুকুম করে এটা ওটা করার জন্য। মেজ খুড়ার মেয়ে পদ্ম হল তার হাতের দোসর। ওপাড়ার অতসী আসে মাঝে মাঝে মাকে লুকিয়ে ; তার বিয়ের বয়স হয়েছে, বাড়ী থেকে বার হওয়া নিষেধ। এবছর কম্‌লিরা আসবে বলে এরা আচার, আম্‌সি ইত্যাদি সব সুখাদ্য লুকিয়ে রেখেছে, সেই বাঁশঝাড়ের তলায় চড়াইভাতি করার সময় বার করে নেবে।

পদ্ম, অতসী, সরমা, নীরজা, কম্‌লি আরও দু'একজন মেয়ে মিলে বাঁশঝোপের তলাটা মহাউৎসাহে পরিষ্কার করার কাজে লেগেছে। জলপাইগাছের গোড়ার দিকটাই বেশী সুবিধাজনক মনে হয়েছে তাদের না হলে আবার বেশী ঝোপের তলায় ভয় পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। রাঁধুনী হল সরমা আর জোগানদার হল বাকীরা। জল আনার ভার নীরজার উপর। সমীরদেরও নেমন্তন্ন হয়েছে—নাহলে কি আর ওরা আস্ত রাখবে! হয়তঃ জ্বলন্ত উনানের উপর থেকে খিচুড়ীর হাঁড়িটা দড়াম করে ফেলে দেবে, চাই কি জলও ঢেলে দিতে পারে অত সাধের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে। প্রতিদানস্বরূপ সমীর আর পরেশ মিলে পাশের বাড়ীর দত্তদের গাছ থেকে গোটা-কয়েক বাতাবিলেবু পেড়ে নিয়ে এল, বলল, "নে তোদের নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে, রান্নার ত এখনও ঢের দেরী, এই আধখানা তোরা খা।"

অতসী বলল, "হ্যাঁরে সমীর তোরা কজনে মিলে নিলি অতগুলো আর আমাদের বেলা এইটুকু—"

"বাঃ, আমরা যে কষ্ট করে পেড়ে আনলাম, তার বেলা ?"

"তবে আমরাও তোদের কম করে খিচুড়ি দেব দেখিস !" বলে উঠল কম্‌লি।

ধমক দিয়ে উঠল সরমা, "তুই কি ব্যাটাছেলে নাকি যে ওদের সঙ্গে সমান তাল রাখতে যাস্। ওদের কম দিয়ে আমরা বেশী খাব কিরে ? জানিস্ না মেয়েরা দিয়ে থুয়ে খায় ?"

পাল্টা জবাব দিল কম্‌লি, "কেন ওরা ব্যাটাছেলে ত' হয়েছে কি শুনি ? ওদের কি আরও দুটো হাত আছে নাকি ?"

"তা কেন, ওরা যে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে চাকরী করবে, টাকা আনবে, ওদের বেশী খেতে হবে না ?"

"দেখিস্, আমিও বড় হয়ে কেমন চাক্‌রী করব, টাকা আনব"—ভবিষ্যদ্বাণী করে বসে কম্‌লি।

হো হো করে হেসে উঠে সবকটা ছেলেমেয়ে, "মেয়ের কথা শোন! চাকরী করবে, টাকা আনবে, কে কোথায় শুনেছে এমন কথা ! দুদিন না যেতে বিয়ে হয়ে কোন্ অজ-পাড়াগাঁয়ে যাবি, শ্বাশুড়ির বকুনি খেতে খেতে প্রাণ যাবে, চাকরী অমনি করলেই হল আর কি !"

বাধা দিল সমীর --পরের বকুনি খাওয়াটা কম্‌লির বরাতে আছে জেনে তার কেমন যেন দুঃখ হল কিন্তু উপায়ান্তর ও ত খুঁজে পেল না সে। রক্ষণশীল পরিবারের রক্ত ব'য়ে চলেছে তারও দেহে, তাই কম্‌লির চাকরীর সম্ভাবনাটা হাস্যাস্পদ মনে হলেও আধুনিকতার আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট সংস্কারপ্রয়াসী

মন তার শ্বাশুড়ীর প্রতিপত্তিটা মেনে নিতে চাইল না সান্ত্বনার সুরে বলল, "না না, তা কেন, তোকে লোকের বাড়ীর মেয়েদের পুতুল বানাবার কাজ দেবে।"

চম্‌কে দিল অতসী একেবারে, "হ্যাঁরে কম্‌লি তুই কি ইস্কুলে দিদিমণির কাজ করবি নাকি? তাহলে বেশ হবে।"

ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলে কম্‌লি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। কথাটার অসম্ভাব্যতা তাকেও সচকিত করে তুলেছিল কিন্তু সকলের মিলিত আক্রমণে আর তামাসায় দিশাহারা কম্‌লি যেন পথ খুঁজে পেল অতসীর কথায়। সাগ্রহে জবাব দিল, "হ্যাঁ রে সত্যি দেখিস্ আমি বড় হয়ে দিদিমণিই হব। দেখিস না আমাদের গাঁয়ের ইস্কুলটা দিদিমণি পাওয়া যাচ্ছে না বলে চলছে না—তোরাও আর পড়তে পারছিস্ না।"

শিশির টিপ্পনী কাটল, "তাহলেই হয়েছে, কম্‌লির হাতে পড়লে মেয়েগুলোর একেবারে দিগ্‌গজ হয়ে উঠে মাথায় টিকি গজাবে? যা বুদ্ধি মেয়ের "

ফোঁস করে উঠল সরমা, "কেন রে, কম্‌লি তোর চেয়ে পড়াশুনায় খারাপ নাকি? তুই কোন দিন ফার্স্ট হয়েছিস্ নাকি যে ওর সঙ্গে লাগতে এসেছিস্। ভাগ বলছি এখান থেকে সেজদা, না হলে দেব গরম খিচুড়ী মাথায় ঢেলে।"

পরেশ এতক্ষণ নীরব দর্শক ছিল, এসব ছেলেমানুষের কথায় থাকলে তার চলে না—প্রেস্‌টিজ জ্ঞান তার ভয়ানক কড়া। রাগের ভাণ করে বলে দিল, "নেমন্তন্ন করে এনে

ভাগিয়ে দিচ্ছিস্ যে বড়, জানিস্ তোরা মরে গিয়ে কালীঘাটের কুকুর হবি।"

ব্যস্তসমস্তভাবে সরমা বলল, "তোদের কি আমি খেতে বারণ করলাম নাকি, রান্নাই ত হয়নি এখনও। এই কম্‌লি বেগুনগুলো কুটে ফেল্ না? পরেশদা যা ত ভাই, পাতা কেটে আন্‌গে ততক্ষণে ডিমের বড়াটা হয়ে যাবে।"

ব্যস্, সন্ধি হয়ে গেল দুপক্ষে। আসন্ন চাকরীর সম্ভাবনাকে শিকেয় তুলে রেখে ধার করে পরা ডুরে শাড়ীখানি কোমরে গুঁজে কম্‌লি বেগুন কুটতে বসল। সরমা খিচুড়ীর হাঁড়ি নামাতে ব্যস্ত, পদ্ম জোগাড় করে আনা লোহার কড়ার টুকরোটা তিনটে ইঁটের উপর বসিয়ে তলায় দিয়ে দিল খিচুড়ীর উনানের জ্বলন্ত কঞ্চির গোছা। নীরজা আল্‌গোছে খানিকটা তেল ঢেলে দিল। একটু পরেই চড়বড় করে বেগুন ভাজার শব্দ পাওয়া গেল। ততক্ষণে পরেশ প্রেস্‌টিজ-সমস্যা ভুলে গিয়ে পাতা কেটে নিয়ে হাজির। নীরু পাতাগুলো ধুয়ে পেতে দিল নিকানো জায়গায়। খানিকক্ষণ পর্যন্ত আর কোন গোলমাল শোনা গেল না 'আর একটু খিচুড়ি,' 'আঃ ডিম-ভাজাটা বেশ হয়েছে রে!' 'এই অতসী জল দে না, ঝাল লাগছে যে,' এইসব ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

পদ্মদের ঘরে সেদিন সকলের নেমন্তন্ন হল। পদ্মর বাবা কম্‌লিদের মেজকাকা, বিদেশে কোথায় কোন্ জমিদারের কাছারীতে কাজ করেন, কালেভদ্রে বাড়ী আসেন। পদ্ম তার

ছোট বোন কুমুদিনী আর ভাই হিরণ থাকে বাড়ীতে মার সঙ্গে। হিরণের পড়াশোনা বেশীদূর এগোয়নি। বাবা বাড়ী থাকেন না-- মাপিসিমার কথা সে বড় একটা ধর্তব্যের মধ্যে আনে না,—মাঝে মাঝে জ্যেঠারা বকাবকি করেন। কিছুদিন সমীরদের সঙ্গে রাখবার চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু হিরণ 'মৎস্য মারিবে খাইবে সুখে লিখিবে পড়িবে থাকিবে দুঃখে'—প্রবাদ-বাক্যের একেবারে জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই পড়াশোনার জন্য। জজম্যাজিষ্ট্রেট হবার আকাঙ্ক্ষা নাকি তার নাই, যেন সে নেহাৎই দয়া করে পদটা নিচ্ছে না, না হলে সেটা নেবার জন্য সকলে তাকে ঝুলো-ঝুলি করছিল ভাবখানা। সকাল না হতে ছিপচার হাতে বেরিয়ে যায় সে, মধ্যাহ্নভোজন করার জন্য দয়া করে বাড়ী ফিরে আসে, তারপর দিবানিদ্রা, সন্ধ্যায় পাড়াপ্রতিবাসীর খোঁজখবর নেওয়া এই তার সারাদিনের রুটিন। দিন কাটছিল নির্বিবাদে, ইতিমধ্যে হিরণের বাবা-ই বাদ সাধলেন। এবার তিনি ছেলেকে নিয়ে যাবেন কুচবিহার—তার মনিবকে বলে কয়ে রাজী করেছেন। মনিবের মহাল আছে সেখানে। তাকে নায়েবের সহকারী হয়ে কাজ করতে হবে, বলা যায় না আখেরে একটা সুরাহাও হয়ে যেতে পারে। খবরটা বাড়ী এসে পৌঁছেছে। হিরণের বাবা জ্ঞানদাশঙ্কর চিঠি দিয়েছেন ৺পূজার আগের দিন তিনি বাড়ী এসে পৌঁছবেন, লক্ষ্মীপূজার পরই চলে যাবেন, এবার বিশেষ ছুটি পাওয়া গেল না—হিরণকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

সাড়ম্বরে খবরটা প্রচার করে হিরণ। কম্‌লিদের সবাইকে ডেকে বলে দিল, "জানিস্ আমি জমিদারের নায়েব হয়েছি, বুঝে সুঝে কথা বলবি আমার সঙ্গে, নাহলে কাছারীতে বেঁধে নিয়ে যাব।"

প্রতিবাদ করে ওঠে পদ্ম, "নায়েব না হাতী—গোমস্তা, গোমস্তা, বুঝলিরে কম্‌লি বাবুর গোমস্তা হয়েই যা মেজাজ, নায়েব হলে না জানি কি হত!"

ধমকে ওঠে হিরণ, "যা, যা—তুই একফোঁটা মেয়ে—ওসবের কি বুঝিস্? ও নায়েবও যা গোমস্তাও তাই। বুঝলিরে কম্‌লি আমি ভাল খাব পরব কিনা তাই মেয়ের হিংসে হয়েছে আর কি!"

বাধা দিল অতসী, "আঃ কি যে বলিস্ হিরণদা, ভাইএর ভাল হলে নাকি আবার বোনের হিংসা হয়। কবে যাওয়া ঠিক হল রে?"

গম্ভীরচালে জবাব এল, "এইত আজ হল গিয়ে অমাবস্যা আর সাতদিন পরেই ত পূজা, বাবা এসে পড়বেন। তারপর কোজাগরী পূজার আর কয়দিন বা বাকী। প্রতিপদ দিন পূজার পাট সারা হয়ে প্রতিমা তোলা হয়ে গেলেই দ্বিতীয়া দিন রওনা হব।"

"তাহলে এবার কোজাগরীতে রাত জাগা হবে না?"

"তাই হয় নাকি? বরাবরের মত এবারও জাগব! দেখিস নাও নিয়ে আমরা সবাই বার হব, এবার আমি চলে যাব, তাই কিছুই করতে আর বারণ করবে না কেউ। তারপর কম্‌লিরাও

আছে, এবার শিশির, সমীর আমরা সবাই ওপাড়ায় পিসির বাড়ী গিয়ে মজা করে লুচি পায়েস রান্না করে খাব।"

'আর আমরা ? আমাদের বুঝি জাগতে হবে না ?"

"তোরাও জাগবি ! তোদের ত সব বাড়ীর পূজা দেখতেই রাত ভোর হয়ে যাবে।"

সরমা জবাব দিল, "তা সত্যি রে কম্‌লি, এবার আমাদের বাড়ী কি সুন্দর কীর্তন গানের আসর বসবে দেখিস।"

হিরণের চলে যাবার খবরটা সমীরদের কানেও পৌঁছেছে তারা সবাই ব্যস্ত ভাসান দেখতে কে কোথায় যাবে তারই তোড়জোড়ে। শেষপর্যন্ত ঠিক হল বিরাট এক নৌকায় সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেবীপ্রসাদ নিজে যাবেন জালিয়ার হাওরের মুখে। সেরাতটা সেখানেই কাটিয়ে পরদিন ভোরে ফিরে আসবেন বরনী নদীর ভাটি বেয়ে। সঙ্গে থাকবে হরিদাস, কাঁধে লাঠি নিয়ে থাকবে রামচরণ যার ভয়ে এদিকে চুরি ডাকাতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যদি এসে পড়েন তবে জ্ঞানদাশঙ্করও থাকবেন সঙ্গে। বাড়ীতে মেয়েরা থাকবেন তাই আশুতোষ অর্থাৎ বড়কর্তা থাকবেন তাদের দেখাশোনা করার জন্য। তিনি এসব ছেলেমানুষী কাণ্ডের ধার ধারেন না— ভাসান দেখতে আবার হৈ হৈ করে সকলে মিলে যাওয়া কি ? নিজের বাড়ীর ঠাকুর হলেও না হয় কথা ছিল। দেবীটা চিরকালই ঐরকম রইল—যা গোঁ ধরবে তাই। অবশ্য ওর হাতে লাঠি থাকতে কোন শর্মা কাছে ঘেঁষতে পারবে সে ভয় নেই। ছোটবেলায়ই ভয় ডর কিছু ছিল না, এখন ত বলে

যথেষ্টই বয়স হয়েছে। কোনোদিন কারো কথা শুনল না—একলাই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে—একলাই জ্যোৎস্নারাতে বারো চৌদ্দ মাইল পথ হেঁটে বাড়ী চলে এসেছে ; ভূত বা মানুষ, দেবতা বা অসুর সসম্মানে পথ ছেড়ে দিয়েছে তাকে। তিনি নিজে ত কই কোনদিন অমন নিঃশঙ্ক, অমন দুঃসাহসী হতে পারেন নি আর তেমনি পড়েও রইলেন চিরটাকাল এই অজ পাড়াগাঁয়ে। ভাইয়ের উপর কেমন যেন সশ্রদ্ধ ঈর্ষ্যার ভাব উৎপন্ন হয় আশুতোষের। অবশ্য এখানে সম্মান আছে, প্রতিপত্তি আছে, খাবার ভাবনাও দেবী রোজগার করার পর থেকে ঘুচে গিয়েছে। না হলে কি দুর্দিনই না গিয়েছে। বড় বৌ মারা গেল একমাত্র ছেলে রেখে—সঙ্গে সঙ্গে যেন সংসারের কাজকর্মে ফাঁকি দেবার জন্যই মেজ বৌও চলে গেল স্বর্গে। তিনি কি নূতন কেনা জমিজায়গার তদারক করবেন, না ছেলের ভাইপোর তদ্বির করবেন, না নিজেই রান্নাবাড়া খাওয়াদাওয়া করবেন। ছোটবৌ যেন এসে বুক দিয়ে পড়ে সংসারটাকে আগলে রাখল, তারপর ধীরে সুস্থে আবার সংসার আগের মত চলতে লাগল। মেজবৌ এল আবার গরীবের ঘর থেকে, বড় বৌকে ও আনা হল সমান ঘর থেকে। এখন তাঁর ছেলেমেয়ে, মেজ ভাইয়ের ছেলেমেয়ে, সংসার জমজমাট। তবে, ঐ যা, দেবী বৌকে এখানে কিছুতেই রাখবে না তাহলে ত আরও ভাল করে সংসার চলত। তবে আবার বৌয়েরা ঝগড়াঝাঁটি করে আলাদা হয়ে গেলে একেবারেই হয়তো সম্বন্ধ রাখত না, এ একপক্ষে ভালই হল।

পাঁচ

আগমনীর পরই আসে বিদায়ের পালা, আবাহনের পরই বিসর্জন—জগৎজুড়েই এই নিয়ম। আজ যাকে অতি আদর করে আগ্রহভরে ডেকে নিয়ে এলাম, দুদিন পরই তাকে বিসর্জন দিতে হয়। কাউকে বা সাধ করে ছেড়ে দেই, কাউকে বা ধরে রাখতে পারিনা, তাই যেতে দিতে হয়। যাকে সাধ করে ছেড়ে দেই তাকেও বিদায় দিতে গিয়ে চোখ হয়ে আসে সজল। যাকে রাখতে চাই তাকেই যেতে দিতে হয় সকলের আগে। সুন্দর ফুলটি মানুষ গাছের বুক থেকে ছিঁড়ে নেয়, গাছের মূক বেদনা তার অন্তরে বাজেনা।

যাকে তিনদিন ধরে আগ্রহ উৎসাহ আনন্দ নিয়ে পূজা করে এসেছে তাকে বিসর্জন দিল মানুষ। আর রাখবার উপায় নেই। এত আলো, এত হাসি, এত বাজনা সবই ম্লান হয়ে গেল একনিমেষে। বাদ্যভাণ্ড কলরোল নীরব হয়ে গেল, অসহ্য এ নীরবতা যেন বুকের উপর চেপে বসতে চায়। জালিয়ার হাওরের জলে প্রতিমা নামিয়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসছে সবাই, আকাশে শুক্লা দশমীর চাঁদ চারিদিকে বিস্তার করেছে মোহময় আবরণ, মন ভারাক্রান্ত। নৌকা চলেছে তরতর করে বাড়ীর দিকে, ছেলেবুড়ো সকলেই বিষণ্ণ, ক্লান্ত। কেউ বা ঘুমিয়ে পড়েছে. কেউ বা ভাবছে আগামী দিনের কথা। এমনি মানুষ! যাকে নাহলে কাল

চলছিল না—আজ তাকে বাদ দিয়ে সংসারের কোন ক্ষতি হয়নি। মুহূর্তে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল সে, আগামী দিনের ভাবনায় চাপা পড়ে গেল বিগতদিনের কাহিনী। না হলে মানুষের অগ্রগতি হত ব্যাহত।

"হায় ওরে মানবহৃদয়
বার বার কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়—"

দিনের পর আসে রাত, রাতের পর দিন। গড়িয়ে চলে মহাকালের রথ। কত কীটপতঙ্গ পশু মানুষের পিষ্ট দলিত দেহের উপর দিয়ে সাম্বৎসরিক ছুটি উপভোগ করতে যান প্রভু জগন্নাথ। কত মর্ত্যের মানব যে তাঁর যাত্রাপথ সুগম করতে প্রাণ দেয় তার হিসাব কে রাখে ? রাখলে তাঁর চলে না। চক্রের আবর্তনে তাই ছেদ পড়েনা, চক্র চলে এগিয়ে গম্ভীর নির্ঘোষে।

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—নব নব রূপে প্রকৃতিকে সাজায়। যে ছিল কিশোর সে পরিণত হয় যুবকে, যে ছিল নবযৌবনে উচ্ছল সে হয় ধীর স্থির, পরিণত। প্রৌঢ় উপনীত হয় বার্ধক্যে, পুরাতনের স্থান দখল করে নূতন।

কম্‌লির মা রোগের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। দেবী-প্রসাদের গাম্ভীর্য বিষণ্ণতার প্রলেপে হয়ে উঠেছে আরও অসহনীয়। ছেলেমেয়ে কটিকে সারাক্ষণ তিনি ঢেকে রাখতে চান নিজের ছায়ায়। ছোট্ট মলি প্রায় সারাক্ষণই থাকে

অসুস্থ। কম্‌লি বিষণ্ণমনে একাকী ঘুরে বেড়ায়, ছোড়দা মেজদাও যেন আর তাকে তেমন ক্ষেপিয়ে আনন্দ পায় না। কি যেন হারিয়ে গিয়েছে, কি যেন নেই, নিরানন্দ এসে ভর করেছে তাদের শান্তির নীড়টিতে। মা'ত প্রায় সারাক্ষণই বিছানায় থাকতেন, তার কাছে ত তারা যেতে পেত না তবুও যেন সারা বাড়ী জুড়ে তিনি ছিলেন। ভয়ে ভাবনায় যেরকম সন্তর্পণে খেলাধূলা করতে হত ওদের, এখন ত আর সে ভয় নেই, তবু কেন ভাল লাগেনা! নিস্তব্ধ বাড়ীর আবহাওয়ায় যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আগেরই মত হরিদা রান্না করে, মাতিদি তদারক করে, ওরা স্কুলে যায় বাবা অফিসে বেরিয়ে যান, কেষ্ট হুকুম তামিল করে তবু যেন কিসের অভাব। আস্তে কথা বলে সবাই, কম কথা বলে তারা।

কম্‌লির নিজেরও জীবনে এলো পরিবর্তন। দেহে পরিবর্তন আস্‌ছে দ্রুত মনের পরিবর্তন যেন তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছেনা। কৈশোর যেন যাই যাই করেও যেতে পারছেনা মায়া ছেড়ে, দূর থেকে শোনা যাচ্ছে যৌবনের আহ্বান। মোহময়, প্রাণ আকুলকরা সে আহ্বানে দেহ যদি বা সাড়া দেয় মন ত কই ঘুমিয়ে আছে এখনও। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোর কেটে যেতে চায় যেন, তখনই কৈশোর এসে ফিরিয়ে দেয় মনের নয়ন ; নূতন বেড়ে ওঠা ঘন চুলের রাশি কম্‌লিকে হাত ধরে টেনে আনে সঙ্গিনীদের ভীড়ে। যে সময়টা মেয়েদের কাটে আনন্দোচ্ছল কলহাস্যে, সে সময় সে হয়ে

পড়েছে বিষণ্ণ, গম্ভীর। লম্বায় সে বেড়েছে অনেকটাই তার উপর মাঝে মাঝে শাড়ী পরে সে দৈর্ঘ্যকে বাড়িয়ে নেয়, হঠাৎ দেখলে চমকে উঠতে হয়। মায়ের অবর্তমানে কম্‌লিই বাড়ীর গিন্নী, তার চালচলনটাও এখন প্রায় গিন্নীত্বে পৌঁছবার কাছাকাছি ঠেকে.ছ। গম্ভীরচালে সে মলিকে খাইয়ে দেয়, মাতিদিকে উপদেশ দেয় বাবার খাবারটা গুছিয়ে রাখতে, ইস্কুল থেকে ফিরে হুদ্দাড় করে আর ঘরে ঢোকে না সে, বইগুলি যত্ন করে গুছিয়ে রাখে। হাতমুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে নেয়। তারপর মলির চুল বেঁধে দিয়ে বাড়ীতেই খেলা করে। চাঁপা, মালতী, শিউলী ওদের বাড়ী-তেই আসে আজকাল। বকুল আর শিখার ইতিমধ্যে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ওদের দলটি আস্তে আস্তে ছোট হয়ে এল। শিশির আর অরুণ পাস করে চলে গিয়েছে জেলাস্কুলে ডাক্তারী পড়তে, সমীর বি, এ, পড়ছে কলকাতায়। এবারই পাস করবে। দেবীপ্রসাদের ভাবনা হয়েছে কম্‌লিকে নিয়ে তাই তিনি ঠিক করেছেন তাকে পাঠিয়ে দেবেন কলকাতায়। ওর মামার বাড়ী থেকে পড়াশোনা করবে। তারপর সে-খান থেকেই বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। কম্‌লির মায়ের বড় ইচ্ছা ছিল, কম্‌লি বি, এ, পাস করে, কিন্তু তিনি বেঁচে থাকলে যদিও বা হত, এখন এই মেয়েকে তিনি কি করে ঝিচাকরের জিম্মায় ফেলে রাখেন? তারপর পড়তেও যদি হয় সেও ত আর এখানে সম্ভব নয় নানাকারণেই, সারাক্ষণ তিনি চোখে চোখে রাখতে পারবেন না। তার কখন কি

প্রয়োজন, কিরকম শিক্ষা দিলে ভাল হয় তা তিনি পুরুষ মানুষ কি করেই বা জানবেন? অবশ্য মেয়েদের কোন বোর্ডিং এ রাখলে হয়, কিন্তু তাই বলে এইসব মেয়েদের বোর্ডিং-এ তাঁর বাড়ীর মেয়েরা গিয়ে থাকতে পারে না, কলকাতায় তাঁর অমন সুবিধা রয়েছে মামারা চাকরী করে মামীরা একটা মেয়েকে আর দেখে রাখতে পারবে না? খাবার ভাবনাত তার নাই, খাবার পরবার জন্য ত তিনি পাঠাচ্ছেন না— পড়াশোনা, সংশিক্ষার জন্য, বড় মেয়েকে নারীবর্জিত গৃহে রাখা অসুবিধা হবে বলেই পাঠাবেন—নিতান্ত ভার-বোঝা হবে কি কম্‌লি, মনে ত হয় না!

ছয়

তুমুল ঝগড়া লেগে গিয়েছে ভাইবোনদের মধ্যে। এ বলে 'তুই আগে মেরেছিস্,' সে বলে 'ও আগে মেরেছে!' ইতিমধ্যে হঠাৎ সব চুপ। দেবীপ্রসাদের গলার অওয়াজ পাওয়া গেল। তিনি নিত্যকার সান্ধ্যভ্রমণ সেরে বাড়ী ফিরছেন। দূর থেকেই হাঁক দিলেন, কিরে তোরা পড়ছিস্ না যে! অমনি শুরু হয়ে যায় সমস্বরে—"Let A B C be a triangle ...

"নাই কিরে সুখ, নাই কিরে সুখ,
এ ধরা কি সুধু বিষাদময়……"
"মাসমাহিনা যার যত, দিন তার পড়ে কত?"
"রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে···· "

কে কত চেঁচাতে পারে তার মহড়া শুরু হয়ে গেল। দেবীপ্রসাদের গলার আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতেই ক্রমশঃ পড়ার আগ্রহে মন্দা পড়ে এল। কম্লি বলল, "এই ছোড়্দা তুই নিশ্চয় আগে মেরেছিস্।" ছোড়্দা তখন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে লাল পেন্সিল দিয়ে মানকুমারী বসুকে গোঁফ পরাচ্ছিল, অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল "হুঁ।" আর যায় কোথায়! গর্জন করে উঠল পরেশ--"তবে রে হতভাগা আর এতক্ষণ ধরে আমাকে বলছে মারে নি।"

সমীর তেড়ে উঠল, "ত্যাখ পরেশদা তুই ভারী ঝগড়াটে। মারবনা কেন শুনি? তুই ত আমাকে আগে বললি যে ছোটমামা এলে আমাকে জাগিয়ে দিবি আমি একটু ঘুমিয়ে নেই। তা আমি শুনলাম বাবা আসছে—হাতের কাছে ছিল ঐ গোল রুলকাঠিটা, তাই দিয়ে তোর মাথায় বসালাম বাড়ি, আমার কি দোষটা হয়েছে তাই বল! উপকার করতে গেলাম তা' আঁচড়ে কামড়ে দিলি একাকার করে তায় আবার গালাগালি দিচ্ছিস্—তুই ভারী অকৃতজ্ঞ!"

গম্ভীর হয়ে পরেশ বলল, "তা সত্যি আমারই মনে ছিল না। আচ্ছা কি আর হবে, না হয় আমার মাথার পাশটা একটু ফুলেই গিয়েছে—এবার থেকে কিন্তু ভাই আর মারামারি নয়—আস্তে ধাক্কা দিবি, না হয় অল্প একটু চিম্‌টি কাটবি। তাহলেই হবে কেমন? আমি এই চোখমুখ ধুয়ে আসছি আমার আর ঘুম হবে না। তোরা যদি কেউ চাস্ ত ঘুমিয়ে নিতে পারিস্।"

শিশির বলল, "যা ক্ষিদে পেয়েছে, কেষ্ট এখনও ডাকতে আসছে না কেন রে?"

পায়ের তলা থেকে কেষ্ট জবাব দিল, "ডাকব কি করে? হরিদা বলে দিয়েছে আজ তোমাদের খেতে দেরী হবে, মাংস রান্না হচ্ছে যে!"

সকলে চেঁচিয়ে উঠল—"মাংস! উঃ কত কাল যে খাই না!"

কম্‌লি বলে উঠল, "কি মিথ্যেবাদীরে তুই মেজদা সেদিন

না কালীপূজায় কতবড় পাঁঠাটা বলি হল আর তুদিন ধরে এত এত মাংস খেলি ?"

ধম্‌কে দিল পরেশ, "থাম্ বল্‌ছি পেত্নী কোথাকার! সেদিন ত খেয়েছি বলি দেওয়া পাঁঠা, তার সঙ্গে মাংসের সম্বন্ধ কি!"

"ও মা, কি বোকা তুই! মাংস ত পাঁঠারই মাংস, তা সে বলিরই হোক্ আর কশাইয়েরই হোক্।"

শিশির এবার ফিস্‌ফিস করে উঠল, "এ্যাই—বাবা আসছে!" ব্যস্—আবার পড়া আরম্ভ হয়ে গেল "স্বাধীনতা হীনতায়, কে বাঁচিতে চায়রে কে বাঁচিতে চায়!" —পরেশ এক চিমটি কাটল সমীরকে সে চিমটিতে সমীরের পিঠের খানিকটা ছিঁড়ে ফুলে ছালচামড়া উঠে এল। 'উঃ' করে প্রাণপণে চেঁচিয়ে সে পরেশের দিকে তাকাল লালচোখে কটমট করে। লাগায় আর কি তু'-ঘা! হঠাৎ সামনের দিকে চোখ পড়তেই তাকিয়ে দেখে বাবা একেবারে সামনে। —"কি রে কি হয়েছে, এমন চ্যাঁচালি যে!"

অস্ফুটস্বরে, পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে জবাব দিল সমীর, "কি যেন একটা কামড়াল!"

'কই দেখি!' ব্যস্ত হয়ে ওঠেন দেবীপ্রসাদ, বিছেটিছে হবে হয়তো। "এই কেষ্ট আর একটা আলো নিয়ে আয়!" ইত্যবসরে কেষ্ট এক লাফে একেবারে রান্নাঘরে। "হরিদা, কর্তা এসেছেন, তোমার রান্না হয়নি এখনও, আর বাঁচবে না আজ।"

হরিদাসের বোধ হয় আত্মসম্মানে ঘা লেগে থাকবে তাই বলে উঠল, "কর্তা এসেছেন, তাই কি ? আমি না হয় কর্তাকে ভয় পাই, আগুন ত আর পায় না। মাংস সিদ্ধ না হলে আমি আর কি করব ?"

হরির কথা শেষ হতে পেল না—দরজার গোড়ায় বেজে উঠল কর্তার কণ্ঠস্বর, "কি রে হরি, রান্না হয়নি এখনও ? এতক্ষণ ধরে করছিস্ কি ? আরে, আসনও ত পাতিসনি ? কি আশ্চর্য কটা বাজল সে খেয়াল আছে ? এই কেষ্ট কোথায় গিয়েছিস্ তুই আবার ?"

কেষ্ট বোধ হয় তৈরী হয়েই ছিল, গোটা পাঁচ ছয় পিঁড়ি মাথায় করে এসে হাজির হল, আস্তে আস্তে পিঁড়ি পাতা চলল ঘর জুড়ে। মাতঙ্গিনী এল দুধ আর ফল নিয়ে।

কেষ্ট জল আর পিঁড়ি দেওয়া শেষ করে ধীরেসুস্থে বাইরে বেরিয়েই এক লাফে একেবারে ছেলেদের পড়ার ঘরে। "এই মেজদা, ছোড়দা, লালদা, কর্তাবাবু বসে আছেন তোমাদের জন্য।" ছেলেরা পড়ি কি মরি করে ছুটল।

মাতিদির ডাকে কম্‌লি চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল, "কি ক্ষিদে পেয়েছে রে !"

খেতে বসে বলল কম্‌লি, "বাবা, কাল আমাদের ইস্কুলে ইনস্পেকট্রেস আসবেন—দিদিমণি বলে দিয়েছেন সেজেগুজে যেতে, আমার ত আর ভাল জামা নেই, আমি কি পরে যাব ?"

"কি পরে আবার কি ? রোজ যা পরিস আজও তাই পরবি! সাদা জামা। কেন আজ মাতঙ্গিনী তোর জামা কাচে নি ?"

মাতঙ্গিনী বলল, "হ্যাঁ, ধোপার বাড়ী থেকে পরিষ্কার সাদা জামা এসেছে—তা ছেলেমানুষ সাদা রোজ রোজ পরতে ভাল লাগে না। আরও পাঁচটা মেয়ে কেমন সব সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পরে সাজগোজ করে যায় আর ওর ইচ্ছা করে না ?"

দেবীপ্রসাদ বললেন, "আমার ত ইচ্ছা করে আস্‌মানের চাঁদ ধরে আনি, তাই বলে কি আর তাই পারি ? শোন্ কম্‌লি—'সাদার তুল্য পোশাক নাই, আর ভূমির তুল্য আসন নাই' বুঝলি ? পোশাকআশাকে কেউ কখনও বড় হয় না জানবি। তুই যদি কাল সব পড়ার জবাব দিতে পারিস্ তাহলে দেখবি তোদের ক্লাসের ঐ সব লাল হল্‌দে জামা কাপড় পরা মেয়েদের চেয়ে তোকেই তিনি বেশী ভাল-বাসবেন। তোর নিজের কি গুণ আছে সেটাই সবচেয়ে বড় কথা বুঝলি ?"

কম্‌লি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ বাবা !" চোখে তার ততক্ষণে জল এসে গিয়েছিল—ইতিমধ্যে আবার সমীর আর শিশির ভ্যাংচাচ্ছে আড়ালে। চেঁচিয়ে উঠল কম্‌লি, "বাবা দেখ ছোড়দা ভেংচি কাটছে !"

গম্ভীর ভাবে হাঁক দিলেন দেবীপ্রসাদ, "সমীর !"

শুকনোমুখে সমীর বলল, "আমি কোথায় আবার ভ্যাংচালাম। এই ত আলুর ঝোল দিয়ে ভাত খাচ্ছি।"

"আলুর ঝোল !"

"হ্যাঁ বাবা। এই যে দেখ না, কেষ্ট আবার নূন দেয়নি"

"কিরে হরিদাস ওদের মাছ দিস্‌নি যে, শুধু আলু দিয়ে খাচ্ছে।"

শুক্‌নোমুখে হরিদাস জবাব দিল, "মাংসত খাবে এর পরে তাই মাছটা দেই নি, তাছাড়া মোটে দুখানা মাছ ছিল আপনাকে দিয়েছি।"

"কেন কিসের জন্য শুনি? তোকে না কতদিন বলেছি ছেলেপুলে আমার সঙ্গে এক জিনিস খাবে। আমাকে দুটো মাছ দিয়েছিস্ কেন তাহলে? মাংস ত আমিও খাব। নে রে তোরা এই মাছগুলো নিয়ে নে ভাগ করে। আর একদিন যদি দেখি এরকম কাণ্ড করেছিস তাহলে তোর কপালে দুঃখ আছে বলে দিচ্ছি।"

চেঁচামেচি শুনে কেষ্ট, মাতঙ্গিনী সকলেই দরজার কাছে উপস্থিত।

ততক্ষণে পাতে মাংস পড়েছে—নিঃশব্দ ঘরে শুধু হাড় চিবানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তাও ভয়ে ভয়ে। ছেলেদের তখন আর্ধেক হয়ে এসেছে—হরিদাকে বকুনি খাওয়াবার ইচ্ছা তাদের ছিলনা শুধু কম্‌লির নালিশটাই তাদের ঘুরিয়ে নেবার মতলব ছিল। এ যে উল্টা ফল হল—কাল যদি হরিদা ধরে সকলকে পিটিয়ে দেয় তাহলে?

সাত

কম্‌লি এল শহর কলকাতায়, পড়তে। প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে তার। ইঁটকাঠের গণ্ডীটানা শহর তাকে আকর্ষণ করেনা মোটেই। তাকে হাতছানি দেয় ছোট্ট শহর রাজপুরের শান্ত নির্মল পরিবেশ, চন্দনীর বুকে নেচে চলা ঢেউএর দল ডাকে তাকে ফিরে, নির্জন নদীতীরের আনন্দঘন মোহ তার কাটতে চায় না রূঢ় বাস্তবের কশাঘাতেও। নিজেকে তার মনে হয় বন্দিনী, অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মফঃস্বলের স্বচ্ছন্দ আবহাওয়ায় স্বচ্ছল পরিবারে কেটেছে তার কৈশোর, আজ যৌবনের সন্ধিক্ষণে এত বাধানিষেধের গণ্ডীতে তাই সে হাঁফিয়ে উঠেছে। পদে পদে শিষ্টাচার আর নিষেধের প্রাচীরঘেরা শহর তাকে এমন কিছুই দিতে পারে না যা তাকে আকৃষ্ট করবে তার দিকে। দোষটা অবশ্য শহরের নয়। আধুনিক যুগের সুযোগসুবিধাগুলো যারা গ্রহণ না করে পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকে তারাই চায়না নূতন কেউ এসে সহরের বিন্দুমাত্র গ্রহণ করুক। তাই কম্‌লির মনে হয় তার জীবনের সুখনিশা বুঝি কেটে গিয়েছে, এসেছে দুঃখময়, কর্মময় প্রভাত।

মায়ের মৃত্যুর পর যে গাম্ভীর্য এসেছিল তার জীবনে তা আর প্রফুল্লতায় পর্যবসিত হতে পারে নি। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত ছিল তার রাজপুরের জীবন, আর আজ বাধা-

নিষেধ আর শাসন তাকে বন্ধ করছে শিকলঘেরা ছোট খাঁচায়। এটা করবেনা, ওটা গেঁয়ো অভ্যাস, ওখানে যাবেনা, ওর সঙ্গে কথা বলা রীতিবিরুদ্ধ, জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তার। সমাজের যে দিকটা, যে অন্যায় অবিচার আরও দশ বছর পরে চোখে পড়লে সে নিতে পারত যুক্তি আর বুদ্ধির গোচরে তাই আজ অতি সহজে চোখে পড়ে করে তুলল বিদ্রোহী। মামার বাড়ীর আবহাওয়াটি নিতান্ত রক্ষণশীল নয়, তবে যাকে হাতে পেয়ে ভান করতে হয় মানুষ করার তার উপর শাসন আর শোষণখড়্গ উদ্যত হয়ে থাকে সব সময়। যে কখনও ক্ষমতা হাতে পায়নি সে যদি হঠাৎ কোটালের পদ পায়—তাহলে সে সাধারণতঃই ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। কম্‌লির বেলাও হল তাই। মামা মামী অথবা তাদের ছেলেমেয়েদের বেলা যে শাসন প্রযোজ্য নয়—সে রীতিনীতি কম্‌লির পক্ষে খাটেনা, কারণ সে গাঁ থেকে শহরে এসেছে। যে সে শহর নয় আবার, শহর কলকাতা! তার তুলনায় রাজপুর গাঁ বই কি, বিশেষ করে মামীদের কাছে। তারাও আবার গাঁয়েরই মেয়ে কি না! মামামামীর সাংসারিক ব্যাপারে কম্‌লির কোন প্রয়োজনও নেই আর সে প্রশ্নও নেই কারণ মামার সংসারে গৃহিণীর অভাব নেই। মোটামুটি স্বচ্ছল সংসার, ঝিচাকর প্রয়োজন মত রাখা হয়েছে ছেলেপুলেও বেশী নয়—কাজেই মামীদের অখণ্ড না হলেও যথেষ্টই অবসর। সে অবসর সময়টুকু এতকাল কাটছিল দুই জায়ে খুঁটিনাটি নিয়ে রেষারেষিতে,

ঝিচাকরের দোষত্রুটি অন্বেষণে আর কার স্বামী পরিবারের কতখানি তার চুলচেরা হিসাবে। হঠাৎ কম্‌লি মলি এসে পড়ায় তাদের একটা কাজ জুটেছে তাদের মানুষ করা! মনোযোগটাও তাই দুজনেই বিষয়ান্তরে দিতে পারায় নিজেদের মনোমালিন্য আপাততঃ স্থগিত আছে। যে ননদিনীকে তারা চোখে দেখেননি তাঁর দোহাই দিয়ে তাঁরা কম্‌লিদের সুশিক্ষার ভার নিয়েছেন। মেয়েটা যে অপদার্থ আর অকর্মণ্য বাবামায়ের হাতে পড়ে একেবারে বিগড়ে গিয়েছে সেবিষয়ে তাদের আর কোন সন্দেহই নাই। কথায় কথায় কয়েকদিন তারা জানিয়ে দিয়েছেন তারা মলি আর কম্‌লির চেয়ে অনেক বেশী উন্নত, অনেক উচ্চশিক্ষিত। বাপের বাড়ীতে তাদের অন্যোভক্ষোধনুর্গুণঃ না হলেও অবস্থা স্বচ্ছল নয়—বৃহৎপরিবারের খাঁই মেটাতে হয়—আর কম্‌লির বাবার আর্থিক অবস্থার কথা তাদের ভালই জানা আছে। তাই কারণে অকারণে তাকে ঠেস দিয়ে জানাতে হয়—আমার বাবা বড়লোক নয়, কিন্তু আমরা কোনদিন অভাব বুঝিনি। অর্থাৎ আমরা যে বিলাসিতায় মানুষ তোরা গেঁয়ো লোক তার মর্ম কি বুঝবি! কত আত্মীয় কুটুম্ব, আসাযাওয়া খাওয়াদাওয়ার সে কি ধুম! বয়েসটা কম্‌লির বড়ই কম নাহলে সে বলত—তোমাদের এত বিলাসিতা, খাওয়াদাওয়া করতে হলে যে বাবাভাইকে চুরি করতে হবে! না হলে আসবে কোথা থেকে!

কম্‌লির মায়ের কাজকর্মের খ্যাতি ছিল, সে খ্যাতির

আড়ালে পাছে চাপা পড়ে যান তাই, নিজেদের অপটু হস্তের কাজকর্মের বড়াই করেন তারা। প্রতিবাদ করতে পারে না কম্‌লি, চোখের সামনে পটুতার অভিজ্ঞান দেখতে পেয়েও। তাহলেই মামাদের কাছে নালিশ যাবে 'ভাগ্নীকে এনে জুটিয়েছ কোথা থেকে এখন একে মানুষ করি কি করে? কোন কথা বলতে গেলেইত চোপা করবে। কিছু শেখাতে গেলে শুনবে না যেন আমরা সব দাসী বাঁদীর দল, উনি মহারাণী, তার হুকুম তামিল করব আমরা' সে আর এক অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত। তারপর মামাদের বকুনি, মাঝে মাঝে দু'চারটা পাখার বাড়ী, সেটা অবশ্য মলির উপরই বেশী, অশান্তির একশেষ একেবারে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি কম্‌লি সংযম হারায় না, মলির তুলনায় বয়সটা তার বেশী। ছেলেমানুষ মলি প্রতিবাদ করে বলেই অত্যাচারটা তার উপর বেশী। কম্‌লি বাইরে প্রতিবাদ করে না বলেই অন্তরে জমে ওঠে তার ক্ষোভ! ক্ষোভ সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের প্রতি! তবে প্রতিবাদ না করলেই যারা ক্ষান্ত দেয় মামীরা মোটেই সে স্তরের লোক নন। নিস্তার নেই তার কিছুতেই, "আমাদের কথা রাজরাণীর কানে যায় না আমরা ত আর ধেই ধেই করে নৃত্য করতে পারি না। কি অসভ্য মেয়ে রে বাবা! একটুও সহবৎ জ্ঞান নেই। একেবারে শেয়াল কুকুরের মত!"

এ যেন ক্ষমতালোভীর অত্যাচার আর স্বার্থপরতার অবিচার দুইয়েরই পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে কম্‌লির উপর। মজার কথা এই যে দুজনের খুঁটিনাটি নিয়ে মনকষাকষি ঘুচে গিয়ে

এবার একযোগে তারা কাজ করতে আরম্ভ করেছেন। কম্‌লির শিক্ষার চাপে তলিয়ে গেছে তাদের মনান্তর আর মতান্তর। মানুষ—বিশেষ করে অন্তঃপুরে আবদ্ধ ক্ষুদ্র স্বার্থ-সম্পন্ন অল্পশিক্ষিত নারী চোখের বাইরে আর কিছু দেখতে পায় না। দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করে বদ্ধমুষ্টি আড়াল করে ফেলে ভাস্করকে। অনেক পরে পরিণত বয়সে কম্‌লি বুঝতে পেরেছিল সারাদিন-রাত সামান্য রাঁধা আর খাওয়া নিয়ে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে পরনির্ভরশীল হয়ে থাকলে মানুষের দৃষ্টিশক্তি সঙ্কীর্ণ হতে বাধ্য। বৃহত্তর জগতের খবর অন্তঃপুরে পৌঁছায় না। শুধুমাত্র নিজের স্বামী পুত্রের সুখ সুবিধা তথা সাংসারিক নিরাপত্তার আয়োজনে ব্যস্ত নারীজীবন তাই আমাদের দেশে নিতান্ত ক্লান্তিকর বিরক্তিদায়ক। সে একঘেয়েমির প্রতীকারও কেউ খুঁজে পায় না চার দেয়ালে মাথা ঠুকে রক্তপাত হয় মাত্র। অথচ মস্তিষ্ক তার কাজ করে যাবেই। প্রয়োজনীয় কর্মের অভাবে নানারকম অবাঞ্ছিত তিক্ততা এসে বাসা বাঁধে সেখানে। তারই প্রকাশ হয় আশ্রিত পীড়নে, সন্তান শাসনে—আত্মম্ভরিতায় আর পরচর্চায়। এইজন্যেই বোধহয় বলা হয়ে থাকে Idle brain is devil's workshop. কারণ কথাটা কেবলমাত্র মেয়েদের সম্বন্ধে নয় পুরুষদের সম্বন্ধেও সত্য। পড়াশোনার এবং সংস্কৃতিচর্চার বালাই যাদের নাই, কোনরকমে পরের উপর নির্ভর করে দুবেলা ভাতকাপড়ের সমস্যা মিটিয়ে নিয়েছেন যারা কিংবা পৈতৃক সম্পত্তি থেকে কোনরকমে মাথাগুঁজে খেয়ে

পরে আছেন -- জীবনযুদ্ধে নামেন নি যারা, পরের উপার্জনে ভাগ বসিয়ে নিজের পরিশ্রম বাঁচিয়ে নিয়েছেন, তারাই যোগ দেন অন্যবাড়ীর ঝি বউ অথবা নিজের আত্মীয় স্বজনের কুৎসা রটনায়, ঘরের ঝি বউ এর পক্ষপাতিত্ব আবিষ্কারে। পাড়ার যত খবর তাদের কাছেই সংগ্রহ করা যায়। স্বাধীনতা লাভের বলি হিসাবে পূর্ববঙ্গবাসী মধ্যবিত্তদের যত অসুবিধাই হোক না কেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, একদল পর-চর্চাকারী, কর্মবিমুখ বাঙ্গালীর কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। মহৎ দুঃখের মধ্যদিয়েই আসে বৃহৎ কল্যাণ। হৃতসর্বস্ব হয়ে বিদেশে এসে আজ যারা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন তারা মানসিক দিক দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছেন। আজ যে প্রত্যেক পরিবারে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে পড়াশোনার চর্চা বেড়েছে তাও এর পরোক্ষ ফল বৈকি। উদ্বাস্তু পরিবারে একের উপার্জনে সংসার চালনা অপেক্ষা পরিবারের ছেলেমেয়ে সকলেই উপার্জনক্ষম হয়ে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার কামনাই করে। তাই শুধুমাত্র পাস করা নয়, সেই সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যা শেখার দিকেও ঝোঁক গিয়েছে আর তার ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সমাজ জীবনে সুফল আসতে বাধ্য। প্রতিটি নারী যখন তার সহকর্মীর সঙ্গে কাজ করে ফিরে এসে প্রবেশ করবে শান্তির নীড়ে, স্বভাবতই তুচ্ছ দৈনন্দিন স্বার্থপরতা তার দৃষ্টি অতিক্রম করে যাবে। খাওয়া থাকাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য না হয়ে ভবিষ্যৎ সমাজের কল্যাণই হবে একমাত্র কাম্য। নূন আনতে যদি পান্তা না ফুরিয়ে যায়,

বাইরের জগতে চোখমেলে তাকাবার পথ যদি খুলে যায়—রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা'র একঘেয়ে বিরক্তিকর পরিবেশ থেকে কিছুক্ষণের জন্য যদি পাওয়া যায় বিরতি—-অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ফলে নারীও যদি পায় সমাজে নিজের স্থান– সংকীর্ণতা আসবে কোন পথ দিয়ে? তাকে হেসে উড়িয়ে দেবার মত উদারতাও আপনি এসে দেখা দেবে তার মনে। যার হবে না—তাকে আর পাঁচজনে উপেক্ষা করলেই আপনা হতেই হবে তার সংশোধন। মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিই হল অন্যের প্রতি মমতা, সুস্থমস্তিষ্কে কেউ অন্যকে অনাবশ্যক আক্রমণ করে না, যারা করে তাদের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। সে অসুস্থতা সবসময় দেহের নয়—সবসময় মনেরও নয়—সে অসুস্থতার মূল রাষ্ট্রে, সমাজে, গৃহে। তারই সাময়িক প্রকাশ মানুষের ব্যবহারে। যে সমাজ ও রাষ্ট্র এতগুলি শ্রমপারগ স্ত্রীপুরুষকে রেখেছে অকারণ আলস্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত, তারা কি দেবে সেই সমাজকে? সুস্থ সমাজবোধ? সামাজিক উন্নতি? সে আশা যে করে সে হয় বাতুল না হয় দৈববাদী।

আট

বাঙ্গালীসংসারে মেয়েদের বয়স ক্যালেণ্ডারের হিসাবে বাড়ে না। বাড়ে তার পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে। পনর ষোল বৎসরের কিশোরী বাঙ্গালীসংসারের গৃহিনীপদে অধিষ্ঠিতা হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তার উপর পড়ে সংসারের কর্তৃত্ব। শ্বাশুড়ী শ্বশুরের সেবা, দেওরননদের অত্যাচার সহ্য করতে হবে, তার উপর পান থেকে চূণ খসলেই বিপদ। আর সে কিশোরী যদি অবিবাহিতা, পরের সংসারে অবাঞ্ছিতা হয় তাহলে তার আর অপরাধের সীমা থাকেনা। কম্‌লিরও তাই পদে পদে অপরাধ, তার দেহে রূপের আবির্ভাবটাও অন্যের চোখে ভাল ঠেকেনা, আশেপাশের পাঁচজনের ঈর্ষ্যার উদ্রেক করে। এর উপর বাধল যুদ্ধ। শহরে বন্দরে হু হু করে জিনিসপত্রের দর বাড়তে লাগল, রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারী ট্রাকের দল উদ্ধত হিংস্র শ্বাপদের মত নখদন্ত উদ্যত করে চলতে লাগল সহরের বুক চিরে। সাদা, লাল সৈনিকের দল বন্দুক উঁচিয়ে মার্চ্চ করে চলতে লাগল সদর্প ভঙ্গীতে। আতঙ্ক আর আশঙ্কায় ব্যস্ত হয়ে উঠল শহরবাসীর দল। নাগরিক জীবন হয়ে এল বিপর্যস্ত।

এর ঢেউ এসে লাগল কম্‌লিদেরও পরিবারে। তরুণী মামীরা নিজেদেরই সামলাবে না বয়স্থা ভাগ্নীকেই সামলাবে? পরের মেয়ের দায়িত্ব ত আর চাট্টিখানি কথা নয়! কোন্‌দিন

কোথায় কোন্ বিপদ দেখা দেবে তার পরে সে 'ম্যাও' সামলাবে কে? তার চেয়ে বন্ধ হোক্ তার পড়াশোনা, বন্ধ হোক তার বাড়ীর বা'র হওয়া। তার মানে বাইরের জগৎ থেকে কম্‌লির চিরনির্বাসন। যেটুকু সময় সে সাংসারিক জগৎ থেকে আলাদা হয়ে সঙ্গীসাথীর কাছে থাকতে পারত, সেটুকুই তার সান্ত্বনার সময়। না হলে সারাদিন অশান্তি আর দুঃখভোগের পালা কম্‌লিকে একেবারে অস্থির করে তোলে। বাইরে প্রশান্তির ভাব বজায় রেখে অন্তরে সে একেবারে হিংস্র হয়ে যেত যদি কিছুটা সময় এ আবহাওয়া থেকে না বার হতে পারত। অথচ মামামামীদেরও দোষ দেওয়া যায়না। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের আজকাল আর রাস্তায় দেখা যায় না। এই যে সেদিন এসেছিল পাশের বাড়ীর শিপ্রা দত্ত, কি একটা চাক্‌রী পেয়েছে বলল। নামটা খুব গালভরাই বটে, 'উইমেনস্ অক্সিলিয়ারী কোর্'—আসলে ঐ যে 'ওয়াকি' ওরা। পরিবারটা ত একেবারে খারাপ ছিলনা, বাপের চাক্‌রী গেল, বড় ভাইটা মারা গেল গতবছর, কি আর করে—যুদ্ধের সময় চাক্‌রী নিল, কিন্তু এসব মেয়ে কি আর শেষে ভাল থাকবে? না এদের সঙ্গে ভদ্রঘরের মেয়েদের মেশা উচিত? সেদিন যখন কম্‌লির কাছে এসেছিল শিপ্রা চুপিচুপি বড়মামী শুনেছেন সব কথা! কি মেয়ের সাজের ঘটা! ঠোঁটে লিপষ্টিক, পাত্‌লা শাড়ীর ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে দেহের শোভা! মাগো! পুরুষের সঙ্গে কি করে কথা বলে মেয়েটা এই বেশে! মায়াবিনী আবার এসেছে এখানে

আমাদের ভোলাতে! ওসবে আমরা ভুলি না বাপু। আর ঐ ছুঁড়িকে বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া হবে না, ছলাকলায় কম্‌লিকে যদি ভুলিয়ে দেয় ওর বাপের কাছে জবাব দেব কি ?

নিতান্ত নিরুপায়, পেটের দায়ে আত্মবিস্মৃত যে সব মেয়ে যোগ দিয়েছে এই কাজে তাদের আর সমাজে ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে আর ভদ্রকন্যাদের মেলামেশা করা পোষায় না। অথচ শিপ্রা দত্ত আর কি করতে পারত তা কিন্তু কেউ বলে দেয়নি। ভিক্ষা করার বদলে 'ওয়াকি' হতে গেল কেন, সে খোঁজ কিন্তু নেবার দরকার নেই কারো! "স্বেচ্ছায়" যে মেয়েরা সৈনিকের ট্রাকে যুদ্ধে সহায়িকা হিসাবে ঘুরে বেড়ায় মুখে তাদের রুজলিপষ্টিক, চোখে তাদের কাজল, পরণে রুচিবিগর্হিত পোশাক, ঠোঁটে মৃদু হাসির আমেজ। চেহারা দেখলে কি কেউ বুঝতে পারবে যে সে 'স্বেচ্ছার' পিছনে কত চোখের জল, কত দ্বন্দ্ব, কত অনিচ্ছার, বাধ্যতার, কত অনাহার ক্লিষ্ট দীর্ঘ দিবসরজনীর ইতিহাস রয়েছে! পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত বিধি নিষেধের বন্ধন ছিঁড়ে শত শতাব্দীর সংস্কারের বোঝা ঝেড়ে ফেলে তারা অর্থ উপার্জনের পথে নেমেছে। সে অর্থও যদি কর্তৃপক্ষের হুমকিতে জরিমানা দিতেই বেরিয়ে যায়, পদোন্নতি অর্থাৎ মাহিনাবৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় সহকর্মী অর্থাৎ সহচর পুরুষ, সাধ্য কি তাকে খুশী করার জন্য সাজপোশাকে উদাসীন থাকে সে। তারপর······? একটা যুদ্ধ ভাসিয়ে নেয় সমাজসংসার বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত!

তাই বন্ধনরজ্জু শিথিল হওয়া গোবৎসের মত এই সব নিরীহ মেয়ের দলও একদিন আপনাকে আমাকেই গুঁতোতে আসে। কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে কে তার হিসাব রাখে! আমাদের নিম্নবিত্ত পরিবারে ইম্ফলও যা, সিঙ্গাপুরও তাই; জাপান আর জার্মানী, ইটালী আর স্পেন, রাশিয়া আর হাঙ্গেরী সবই এক, কারণ এই যুদ্ধের ফলেই জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, এরই ফলে চাকরী হারিয়েছে বাপভাই, এই যুদ্ধের ফলেই পরিবারে লেগেছে ভাঙ্গন। তাই যুদ্ধের আশু বিপদ থেকে বাঁচবার জন্য উপায়ন্তরহীন হয়ে যে যা পেল তাই আঁকড়ে ধরল। পাড়ার যত বেকার বখাটে, বাপেতাড়ানো মায়েখেদানো ছেলের দলও এই সুযোগে ঢুকে পড়ল এ, আর, পি তে। তারা নাকি বিমান আক্রমণ থেকে বাঁচাবে আমাদের! খাকীপোশাক পরে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ত্রিশটাকা মাইনে পেয়ে ধরাকে সরাজ্ঞান করতে লাগল তারা। মধ্যবিত্ত পরিবারের কিছু ছেলে যোগ দিল মিলিটারীতে। শিক্ষানবিস সৈনিকের দল মার্চ্চ করে চলে শহরের আশেপাশে। এক ক্যাম্প থেকে আর এক ক্যাম্পে, এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায়। স্কুল কলেজগুলো এক এক করে বন্ধ হতে লাগলো, এত দুঃখেও যাদের মুখের হাসি মিলায়নি সেই স্কুলপালানো ছেলের দল সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে তালে তালে পা ফেলা হবু সৈনিকদের দেখে—ঘাস্ বিচালী ঘাস্। একটু বেশী খাস্—দৌড়ে পালিয়ে যায় আবার সৈনিকদের চোখে চোখ পড়লেই।

জীবন ভোগ করে নিতে শুরু করল একদল। আর নিজেদের সংস্কার, আচার আর ধর্মের দোহাই পেড়ে মনুপরাশর আউড়ে ঘরের শূন্য দেয়ালকে আঁকড়ে ধরল আর একদল। দুর্ভিক্ষে অথবা রাষ্ট্রবিপ্লবে যে সমাজব্যবস্থারও পরিবর্তন হতে বাধ্য, এ সত্য চোখে পড়ল না কারও, তাই অগ্রণী হয়ে ভাঙ্গন রোধ করতে সাহস পেল না কেউ। ফলে রিক্ত মধ্যবিত্তের দল নেমে এলো বিত্তহীনের পর্যায়ে। তবু বেঁচে রইল তাদের নিষ্ফল দম্ভ আর আত্মবঞ্চনার বিলাস। পরিবারের কর্তার উপার্জন সংসারসমুদ্রে বারিবিন্দুর মত নিঃশেষে মিলিয়ে যায় কিন্তু উপায়ই বা কি? ঘরের ঝিবউ ত আর বাজারে বন্দরে চাক্‌রী করতে যেতে পারে না! আবরুই যদি না রইল হিন্দুয়ানির আর রইল কি? তার উপর—চিরকাল ধরে শাস্ত্রকাররা যে বলে এসেছেন "বিশ্বাসং নৈব কর্তব্য স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" তা কি আর মিথ্যা হতে পারে? ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন ঋষিরা—তাঁরা তাই নারীকে তুলনা করে গেছেন নদী, নখী, শৃঙ্গী আর শস্ত্রপাণিদের সঙ্গে! নদীর আছে সর্বনাশা গতিবেগ, হিংস্র প্রাণীদের আছে নখদন্তশৃঙ্গ, বেচারা নিরীহ পুরুষদের এগুলো না থাকায় তাদের পাণিতে আছে শস্ত্র। আর নারী! তার এসব কিছু না থেকেই সে এত ভয়াবহ যে তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য সবসময় থাকতে হয় সশঙ্কিত, তাকে তাই রাখতে হয় সবরকম প্রলোভন থেকে দূরে, চারদেয়াল দিয়ে ঘিরে। অতএব শাস্ত্রের বচন আউড়ে নিজের বা পরের স্ত্রীকন্যাকে আশু সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে

চান যারা, তাদেরই নিজেদের স্ত্রীকন্যা হয়তো। 'বিফলদেয়ালের' আড়ালে দাঁড়িয়ে হাত পেতে অন্ধকারে গ্রহণ করল বিদেশী সৈনিকের হাত থেকে কড়কড়ে স্বদেশী টাকা। সুস্থভাবে গ্রহণ করলে যে নারীর দল সমাজে ভাঙ্গন রোধ করতে পারত তারাই সমাজকে নিয়ে এল প্রায় ধ্বংসের মুখে। কত অসহায় মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে বিদেশী সৈনিকের আর স্বদেশী মিলিটারী কণ্ট্রাক্টারের লালসার ইন্ধন যুগিয়ে নিজের মা বাপকে বাঁচিয়ে রেখেছে সেদিনে কে তার হিসাব রাখে! বাঙ্গালী মেয়ের আত্মদানটা এতই স্বাভাবিক, যে সেটা কারো চোখে পড়ে না, পড়ার মত উল্লেখযোগ্য নয়। কোনো কাগজে ছাপা হয় না সে খবর, পাড়ার মজলিসের রসদ যোগায় না সে আত্মত্যাগের কাহিনী, তাই আজ তার হিসাব নেই।

ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুরের পতন হল। কম্‌লির মামীরা জানমান বাঁচাবার জন্য কলকাতা ছেড়ে চলে এলেন রাজপুরে। কম্‌লিদের পাশে মল্লিকদের বাড়ীটা অনেকদিন খালি পড়ে ছিল, বন্দোবস্ত করে দিলেন দেবীপ্রসাদ—তুষারিকা আর অণিমা সেখানে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। দেখাশোনার ভার রইল দেবীপ্রসাদের উপর। কম্‌লি চলে এল বাবার কাছে। যে কম্‌লি গিয়েছিল আর যে কম্‌লি ফিরে এল এ দুজনের মধ্যে তফাৎ প্রচুর। সে দৌড়ঝাঁপ নেই, সে লাফালাফি নেই, ভারিক্কী, গম্ভীর আপনার লাবণ্যে আপনি ভরপূর। জননী জন্মভূমি যদি মানবীরূপে কম্‌লির

সামনে এসে দাঁড়াতেন তিনিও অবাক হয়ে যেতেন আত্মজাকে দেখে। এ যে আত্মসমাহিতা মহিমময়ী নারীমূর্তি। যে বালিকা রাজপুর থেকে কলকাতা গিয়েছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে আজ হারিয়ে গিয়েছে পাষাণপুরীর অতল তলে। দেহে যৌবনের জোয়ার কম্‌লিকে প্রগল্‌ভা করেনি, করেছে সরমকুণ্ঠিতা; অভিজ্ঞতা আর স্নেহহীন শাসনও তাকে রূঢ় করে তোলেনি, করেছে বিষণ্ণ, শান্ত। অনেক ভেবেছে সে পরে, কেন স্বভাব তার রুক্ষ হয়ে ওঠেনি ? জবাব মেলেনি। বোধ হয় একেই বলে খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি। যখন যা সামনে আসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে গ্রহণ করে যে সেই পারে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে। ক্ষমাশীল শিশুহৃদয় তাই যত বাধাবিঘ্ন ঝেড়ে ফেলে স্বাভাবিক প্রেরণাবশেই হাত বাড়িয়েছে সূর্যের দিকে তবু ভুলতে পারেনি পারিপার্শ্বিকের প্রভাব। মায়ের অভাব তাকে আরও ভাবপ্রবণ করে তুলেছে বিষণ্ণতার মেঘ ছেয়েছে তার আকাশে। যে সময়টা মানুষের জীবনে সবচেয়ে সংকটময়, .যে সময় প্রয়োজন হয় বাপমায়ের সাহচর্যের, সে সময়টাই কম্‌লির জীবনে ভীড় করে এল শাসন, পীড়ন আর বিদ্রূপের বেড়াজাল, অথচ অন্তরাল থেকে ভালবাসা অথবা স্নেহ এগিয়ে আসেনি তাকে সাহায্য করতে। তবু এ দুর্দিন কম্‌লি কাটিয়ে উঠেছে সে কি পিতৃদত্ত স্বাবলম্বনের জোরে না সহজাত আত্মরক্ষার শক্তিতে কে জানে ? চিরকালই আশ্রয় নিয়েছে সে বইয়ের, আজ রাজপুরে এসে আরো বিশেষ করে সে আত্মগোপন করল বাপের লাইব্রেরীর অন্তরালে।

দেবীপ্রসাদের সংগ্রহ ছিল প্রচুর ; ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মাইকেল, রমেশচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতির রচনায় সমৃদ্ধ সে পাঠাগার আকর্ষণ করত তাকে। বিশেষ আকৃষ্ট হল সে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রতি। বাঙ্গালীর মনের তারে তারে ঝঙ্কার দিয়ে যায় যে সুর তা যে তাকেও মোহিত করবে সেটা এমন কি বেশী কথা ? কিন্তু সীতার চরিত্র বড় ভাল লাগলেও মনে হত তার সীতা বড় বেশী মেয়েলিভাবাপন্ন ! সীতা আদর্শ কন্যা, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ বধূ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, না হলে এতকাল ধরে আমাদের হৃদয় মনে চির-স্থায়ী আসন পেতে বসতে পারতেন না। কিন্তু কম্‌লির মনে প্রশ্ন জেগেছে সীতা কি আদর্শ মানবী ? মানুষের প্রতি মানুষের যে ধর্ম, সে ধর্ম কি সীতা পালন করেছেন ? অত্যাচারিতা সীতাকে কেন দিতে হবে অগ্নিপরীক্ষা ? কেন সীতা প্রতিবাদ করে রামচন্দ্রকে বলতে পারলেন না—যে তুমি আমার রক্ষার ভার নিয়েছিলে, অপারগ হয়ে এখন দোষ দিচ্ছ আমারই উপর এ কি রকম স্বামীধর্ম ? এ ত দুর্বলের যুক্তি। সমাজ পরীক্ষা না করে সীতাকে গ্রহণ করতে পারে না—তাই অগ্নিশুদ্ধা সীতা পৃথিবীতে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন, কিন্তু রামচন্দ্র ? তিনিও কি তাঁকে অবিশ্বাস করেন নি ? যে সীতা তার চোখের আড়ালে বাস করেছে এতদিন, তাঁকে তিনি গ্রহণ করবেন না স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন। যে বিশ্বাসের ভিত্তি এত শিথিল তার উপর নির্ভর করে সীতা কেন আবার ফিরে গেলেন অযোধ্যায় ? যে সমাজ

নারীকে দেয়নি আত্মরক্ষার অস্ত্র, সে সমাজ কি করে দাবী করে দুর্দান্ত সবলের হাতে নারী থাকবে পবিত্রা ? সবল দুর্বলের রক্ষার ভার না নিয়ে, দুর্বলকে রক্ষা করতে না পেরে দুর্বলেরই উপর চালাবে জুলুম এইটাই বা কি রকম ব্যবস্থা ? এ প্রশ্নের জবাব পেত না কম্‌লি ? পাবার কথাও নয় ! এত অল্পবয়সে, এত অল্পজ্ঞানের পুঁজি নিয়ে এর জবাব মেলে না।

মামীরা ত হতবাক্ ! এ মেয়ে বলে কি ? সীতার চরিত্রে সন্দেহ ? রামচন্দ্রের আচরণে সংশয় প্রকাশ ! বাপে ত আদর দিয়ে মেয়েটার মাথা একেবারে খেয়েছে ! ঠিক বাপেরই মত নাস্তিক হয়ে উঠেছে। মেয়েদের সুনাম আর হাতের শাঁখা একবার ভাঙ্গলে আর জোড়া লাগে না। তাই সীতাকে—সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা সীতাকে অগ্নিপরীক্ষায় প্রমাণ করতে হয় যে তিনি পবিত্রা ! রামচন্দ্রের মত মানুষ, সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম তিনি তাঁর কোন আচরণে ত খুঁত থাকতে পারে না !

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দুরন্ত জিজ্ঞাসায় পীড়িত কম্‌লির মনের সংশয় যায় নি, তাই একদিন ভয়ে ভয়ে বাবার কাছে তুলল কথাটা। দেবীপ্রসাদ তখন একটু শান্ত মেজাজে ছিলেন—আর বহুদিন অনুপস্থিত কন্যার উপর কিছুটা সদয় হয়েও বটে বললেন—ওটা আমাদের বাঙ্গালী সমাজের ধর্ম। মূল রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথাটা ছিল না, ওটা পরে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করা হয়। বৈদিকযুগে নারীদের কেবলমাত্র নারী বলেই মনে করা হত না। তাদেরও বিচার হত মানুষের

মর্যাদার ভিত্তিতে। রামচন্দ্র যখন লোকনিন্দার ভয়ে সীতাকে পরীক্ষা দিতে বলেছিলেন তখন সীতা জবাব দিয়েছিলেন—"তোমার অক্ষমতার দরুণ রাবণ আমাকে হরণ করেছিল আমার যথাসাধ্য আমি আত্মরক্ষা করেছি এর জন্য তুমি পরীক্ষা চাও কেন?" সেই ঘটনাই দেশীয় রামায়ণে রুচিমত রূপান্তরিত হয়েছে অগ্নিপরীক্ষায়। করুণ রস আমাদের প্রাণের সঙ্গে খাপ খায় বেশী, তাই আমরা এই অগ্নিপরীক্ষায় এত আনন্দ পাই। আর সীতার তিরস্কারে রামচন্দ্রকে ভীরু বলা হয়েছে। এই অপবাদে আমাদের ব্যক্তিপূজার আদর্শ ব্যাহত হয় তার আরও প্রমাণ আছে। রামচন্দ্র বনে যাবার সময় সীতাকে রাক্ষসের ভয় দেখিয়েছিলেন—সীতা তখন তাকে বলেছিলেন—'আমার পিতা রাজর্ষি জনক তোমাকে চেহারায় পুরুষ ও আচরণে কাপুরুষ বলিয়া মনে করেন নাই। রাক্ষসের হাত হইতে স্ত্রীকে রক্ষা করিতে তোমার এই ভীরুতার প্রকাশ যদি আগে পাইত তাহা হইলে তোমার হাতে আমাকে দিবার কথা চিন্তা করিতেন কিনা সন্দেহ।'

ইতিমধ্যে মামারা সে সভা থেকে উঠে গিয়েছেন—এ রকম ম্লেচ্ছপনা তারা সইতে পারবেন না। রামায়ণ মহাভারত নিয়ে সমালোচনা বা তার কথায় সন্দেহ করতে তারা কাউকে এ পর্যন্ত শোনেন নি। রায় মশায়ের একি আচরণ! মেয়েকে ত তাঁর পরের ঘরে পাঠাতে হবে—এত স্বাধীনচেতা যদি এখন থেকে হয় তবে কি করে পরের সঙ্গে মিলিয়ে থাকবে, না কি বিয়ের পরও এ মেয়ের ঝক্কি তাদের পোহাতে হবে! কম্‌লি

সেদিন উঠে যাবার আগে মনে মনে ভেবে গেল—আরও ভাল করে পড়তে হবে—জানতে হবে সব। সংস্কৃতটা যেন পড়েই বুঝতে পারে এরকম হলে মূল বইগুলো পড়ার সুবিধা হবে। কিন্তু শেখার সময় কোথায়? যে রকম উদ্যোগপর্ব দেখছে সে তাতে মনে হয় আর দু'এক বছরের মধ্যেই বিয়ে দিয়ে দেবে, তারপর সেই মামীদের মত জীবনযাপন করতে হবে। এই কি তার ভাগ্য? ভাগ্য কি সত্যিই ভগবান্ গড়েন, না মানুষ নিজে গড়ে? আজ যদি সে প্রতিজ্ঞা করে বিয়ে করবে না অন্ততঃ এখন ত নয়ই তাহলে? না না ছি সে বড় লজ্জার কথা, নিজে কি করে বলবে—এটা কি একটা আলোচনার বিষয়! মা নেই মামীরা ত একেই বিরক্ত হয়ে আছে—বাবার সঙ্গে কি করে এ আলাপ করে? অথচ এই সারাদিন রান্নার ঝক্কি, ঝি চাকরকে বকাবকি, পরের ছিদ্রান্বেষণ, এই দিনগত পাপক্ষয়। ভাবতে ভাবতে কম্‌লির মাথার মধ্যে যেন আগুন ধরে যায়, সংসার বলতে কি এ-ই বোঝায়?

সমবয়সী বন্ধুরা সন্তর্পণে আজকাল এড়িয়ে চলে তার সংসর্গ। তাদের বাড়ীটা আর বন্ধুদের আরামের জায়গা বলে মনে হয় না। কম্‌লির মামীরা যখন আসেন তারা প্রায়ই পালিয়ে যায়—তাঁদের উন্নাসিকভাব ওদের ভাল লাগে না। তার উপর কম্‌লির চালচলনও আজকাল বদলে গিয়েছে, শুধু চাঁপাই এখনও আসে মাঝে মাঝে, তার ভয়ডর বলে কিছু নেই। সেদিন জিজ্ঞেস করল "কেমন আছিস্ রে কম্‌লি।"

হেসেছিল কম্‌লি—"ভালই আছি, দেখছিস্ না!"

"তাত পাচ্ছিই। মাঝে মাঝে আমাদের দিকে গেলেও ত পারিস্। মলিই যাহোক্ তবু সম্পর্ক রেখেছে। তোর ত আর পাত্তাই পাওয়া যায় না। কি শহুরেই না হয়েছিস্ আজকাল ?"

"শহুরে আর হতে পারল'ম কোথায় ? এত বকুনি আর এত বিদ্রূপেও ত সেই রাজপুরেই রয়ে গেলাম। চারদিকে ইঁটকাঠ দেখে যেন প্রাণ হাঁফিয়ে উঠে। কলের ধরা জলে কি সাঁতার কাটা যায় ? তাই যেন এখানে এলে প্রাণটা বাঁচে।"

"সত্যি কেন যে তোকে তোর বাবা শহরে পাঠালেন ? কি হত এমন এখানে থাকলে ? মলিটাও ত দেখ কিরকম রোগা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁরে তোর মামীরা যেন কেমন কেমন ?"

"কেমন আবার কি ? এই যা একটু মুখের সুখ করে নিচ্ছে আর কি আমাদের হাতে পেয়ে আর মলির উপর দিয়ে যাচ্ছে হাতের সুখ।"

"বাবাকে বলতে পারিস্ না ?"

"বলব কি করে ? বাবা কত দুঃখ পাবে বল্ দেখি। আর কিই বা হবে, বলার পরে হয়তো লাঞ্ছনাই বাড়বে আরও, থাকতে ত হবে সেখানেই সহবৎ শেখার জন্য। যাক্ গে আর সকলের খবর কি বল্ ?"

"খবর আর কি। বকুল আর বাণী শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছিল, কি সুন্দর মেয়ে হয়েছে যে বাণীর ! বকুলও এবার মা হবে। চারুদা ত ক্ষেপে উঠেছিল মালতীকে বিয়ে করবে

বলে —অনেক গোলমাল বকাবকি করে করলও বিয়ে। কিন্তু মাসীমার সঙ্গে কিছুতেই মালতীর বনেনা।"

"কেন রে, মালতী ত বেশ ভাল মেয়ে।"

"ভালই ত ছিল। তবে জানিস্ত পাড়ার মেয়েরা মা মাসীদের কাছে আদর পায়, কিন্তু সেই মেয়ে আবার বউ হয়ে এলে সে আদর কোথায় মিলিয়ে যায়!"

"তা চারুদা কিছু বলে না?"

"বলবে আর কি, ছেলেরা বিয়ে করলে একেবারে রামচন্দ্র হয়ে যায়, বাপমায়ের কথায় উঠে বসে। চারুদা ত তবু ভাল মার ধোর করে না। শুধু বলে 'তুমি মা'র কথামত চলতে পার না?' মালতী হেসেই খুন। 'মা চায় পাড়ার লোকের সামনে বউ একগলা ঘোমটা দিয়ে থাকবে, তোমার সঙ্গে দিনের বেলা কথা বলব না—তা-ই কখনও কেউ পারে? আমি ত এখানেরই মেয়ে অত একগলা ঘোমটা টানি কি করে?' তখন দুজনেই হেসে ফেলে আবার মা'কে কিছু বলতে গেলেই মা বলবে তখনি বলেছিলাম ঐ ধিঙ্গী মেয়ে ঘরে আনিস্ না, তা তোর চোখে ত ঠুলি পরিয়েছে হতভাগী, পাড়ার মেয়ে তার পেটে পেটে এত!"

"মাসীমা তাহলে শুধ্‌রে যাবে কি বলিস, না হলে ত মালতীর ভারী কষ্ট হবে।"

"শোধরাবে হয়তো ছেলে হলে, তা সেদিকেও ত হতভাগী হাত ধুয়ে রেখেছে, দু বছর হল বিয়ে হয়েছে এখনও কিছু না।"

"আর শিউলী, অরুণদা, ওদের খবর কি !"

"শিউলী পড়ছে বাড়ীতে। বাবা এক মাষ্টার রেখে দিয়েছেন—ম্যাট্রিক দেবে আসছে বছর ! তুইত দিব্যি পাস-টাস করে ফেললি, এবার কি করবি ?"

"পাস আর করলাম কোথায়, এইত সবে পরীক্ষা দিলাম।"

"তোর সন্দেহ আছে নাকি পাস করা সম্বন্ধে, আমরা ত সবাই জানি তুই আমাদের টাউনের নাম রাখবি।"

"সে দেখা যাবে। এখন অরুণদা কি করছে বললি নাত ?"

"আরে হ্যাঁ তাইত ! অরুণদা ডাক্তার হয়ে ফিরে এসেছে একটুও বদলায় নি। এখনও তেমনি সাঁতার কাটে।"

"তোর সঙ্গে দেখা হয় ?"

"দেখা বিশেষ হয় না। সেদিন মাসীমাদের বাড়ী গিয়েছিলাম ঝড়ের সময় আম কুড়াতে তখন দেখা হল। সকলের খবর জিজ্ঞাসা করল, বিশেষ করে তোর কথা।"

"আমার কথা কেন ?"

দুষ্টুমি ঝিলিক দিয়ে গেল চাঁপার চোখে, "আমাকে জিজ্ঞাসা করছিস্ কেন ? মাসীমার ইচ্ছা এবার ছেলের বিয়ে দেয় তা ছেলে আবার বলছেন মনের মত কনে কোথায় ?"

"হয়তো শহরে আছে, সেখান থেকে নিয়ে এলেইত পারে !"

অন্ধকারেই ঢিল ছুঁড়ল চাঁপা—"শহরেই থাকে রে সে। অরুণদা বোধহয় তোকেই পছন্দ করে কম্‌লি।"

লাল হয়ে উঠ্‌ল কম্‌লির মুখ—"যাঃ তোর মাথা খারাপ হ'ল নাকি ? আমাকে দেখল কোথায় যে পছন্দ করবে।"

"দেখা কি হয়নি নাকি। সাঁতারের কথা কি এরি মধ্যে ভুলে গেলি নাকি ?"

"সে ত ছোটবেলার কথা।"

"এখনই বা তুই কি বুড়ী হয়েছিস্ শুনি ! আর চেহারা খানা কি আয়নায় দেখিস্ না নাকি ? অমন চুলের বোঝা কি বাঁধিস্‌না ! সত্যি কম্‌লি তোর মতন আর দেখলাম না।"

"নে বেশী ফাজ্‌লামো করতে হবে না। দেখ দেখি আমার মামীদের, কি সুন্দর দেখতে ! তার পাশে কি না আমাকে বলছিস্ সুন্দর।"

"তোর মামীদের রূপের বর্ণনা রাখ্। দেহের কোথায়ও কি রসকষ আছে নাকি ? হতে পারে নাকমুখ চোখ মোটামুটি সুন্দর—তবে তোর মত লাবণ্য নেই চেহারায়।"

"ঢের হয়েছে হে প্রিয়ংবদা এবার থামো। অরুণদার ডাক্তারী কেমন চলছে তাই বল্।"

"এই যে মন গলে গেছে দেখছি। অরুণদার পসার হোক্ না হোক্ তাতে তোর কি !"

কম্‌লিও কম যায় না, সে জবাব দিল, "ও আমি জিজ্ঞসা করলে তোর আবার ব্যথা লাগে বুঝি !"

"তবে রে লক্ষ্মীছাড়ী—" গোটা দুই তিন কিল কম্‌লির পিঠে বসিয়ে দিয়ে বলল, "বয়ে গেছে আমার তোর কৃষ্ণঠাকুর নিয়ে টানাটানি করতে, কেন আমার কি মরণ জোটে না নাকি ?"

"সে মরণ কবে হচ্ছে রে চাঁপা ?"

"এই শীগগিরই, বৈশাখ মাসের সতরই।"

"তাই বল্, নিজের ল্যাজ কেটেছে তাই আমাকেও দলে ভিড়াবার চেষ্টা।"

"তা নয়ত কি শুনি ? ঢের ত পড়াশুনা করলি, শেষে ত সেই হাঁড়িই ঠেলবি, তবে অনর্থক কেন সময় হারিয়ে ? তুটো দিন আমোদ আহ্লাদও চাইত ?"

"দেখা যাক্ হাঁড়ি কি কড়া-ই ঠেলি, তবে আমি তোদের মত সংসার করব না ”

তর্কের খাতিরে বলে বটে কম্‌লি—সে বলার পিছনে তেমন জোর কোথায় ? ভরসাও নেই তাই ভয়ও নেই।

এতদিনে কম্‌লির যেন চেতনা ফিরল। কেউ তাকে কোনদিন বলেনি সে সুন্দর। সে শুধু শুনেছে সে বড় হয়েছে —তার শাসনে থাকা দরকার, তার বাইরে যাওয়া নিষেধ, সে ধিঙ্গী মেয়ে। কিন্তু চাঁপা এ কি মন্ত্র দিয়ে গেল তার কানে ? তারও তাহলে রূপ আছে ? আয়নায় যে চেহারাটা দেখে সেটা তাহলে সুন্দরী নারীর চেহারা! এ বয়সে রূপের প্রশংসা শুনলে খুশী হয়না এমন মেয়ে জগতে খুব বেশী জন্মায় না। কম্‌লি নিতান্ত সাধারণ মেয়ে—এতদিন তার নিজের দিকে তাকাবার কথা মনে হয়নি --কি আশ্চর্য, আজ বাইরের এক-জন তাকে বলে গেল তার রূপের দিকে চোখ তুলে তাকাতে। সে নিজে এতদিন করছিল কি ? রাত্রে বিছানায় শুয়ে চাঁপার কথা ভাবতে ভাবতে কম্‌লির মনে পড়ে গেল অরুণদার কথা।

অরুণদা তার কথা জিজ্ঞেস করে—চাঁপা বলে সে তাকে পছন্দ করে—নির্জন ঘরে ষোড়শী কিশোরীর কানে একি মন্ত্র দিয়ে গেল চাঁপা! সারাদেহে তার শিহরণ বয়ে যেতে লাগল, দেহের সমস্ত রক্ত অসহ্য পুলকের বেগ ধারণ করতে না পেরে শিরা বেয়ে এসে জমা হতে লাগল মস্তিষ্কে—লাল হয়ে এল তার মুখ চোখ, এ মুখ চোখ সে লুকাতে পারলে বাঁচে। কি আশ্চর্য! যে অরুণ তার সাঁতারের প্রতিদ্বন্দ্বী, তার শৈশবের খেলার সাথী, পরীক্ষায় সহায়কারী, সে যদি তার কথা জিজ্ঞেস করেই থাকে তাতে কি এসে যায়? এই আত্মজিজ্ঞাসায়ও কিন্তু কম্‌লির মন বেসুরো বাজল না—সবই যেন তার চোখে এক নূতন দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে, চিরপরিচিত সবকিছুই আজ তার কাছে নূতনরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বিনিদ্র রজনীর প্রতিটি মুহূর্ত আজ মায়াময়; এক প্রহরের ব্যবধানে কিশোরী কম্‌লি উন্নীত হয়েছে তরুণীরূপে। উঠে একগ্লাস জল খেল সে। মাথার দিকের জানলাটা খুলে দিতেই মধুগন্ধেভরা একঝলক দখিনা-বাতাস স্নিগ্ধপরশ বুলিয়ে দিল চোখেমুখে। বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে দেওয়া মলিকে ঠিক করে দিয়ে আবার বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল। সুখের আমেজে, তার দেহমনে বয়ে গেল অপূর্ব শিহরণ—তার রেশ মিলাতে না মিলাতে নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ল সে।

নয়

বিধবা মায়ের ছোট ছেলে অরুণ। বড় ছেলে কিরণ পি, ডবলিউ, ডি-র ওভারসিয়ার। মাঝে মাঝে কনট্রাক্টারীও করে। যা পায় তাতে খুব স্বচ্ছলভাবে না হলেও মোটামুটি চলে যায়। সংসারে খরচ তেমন বেশী নয়; কিরণ-এর স্ত্রী রেখা, ছোট্ট মেয়ে লীনা, ভাই অরুণ আর বিধবা মা ইন্দুবালা। ইন্দুবালার বয়স খুব বেশী হয়নি, পঞ্চাশ পার হয়নি এখনও। যেদিন স্বামী মারা গেলেন সেদিনটির কথা এখন আর মনে পড়ে না ইন্দুবালার, শুধু মনে আছে ত্রিশ বছর বয়সে আট বছর আর চৌদ্দ বছর বয়সের দুটি ছেলে নিয়ে অকূলপাথারে পড়েছিলেন, সম্বলের মধ্যে পোষ্টাফিসে রাখা স্বামীর হাজার দুই টাকা আর বাপের দেওয়া দুই একখানা গয়না। তা সে টাকা কয়টিও দেবররা হাতাবার চেষ্টা করেছিল, কারণ অরুণ কিরণের পড়াশোনা খাওয়াপরা তাদেরই ত চালাতে হবে। তাদের কিছু আর জমিদারী নেই, তিন তিনটে লোককে বসিয়ে খাওয়াবে কোত্থেকে? শ্বশুরও কিছু বলেননি উপযুক্ত ছেলেদের বিরুদ্ধে। কিরণ তখন ক্লাস নাইনে পড়ে, বলেছিল, "মা কিছু ভেবো না, আমরা তিনজনে চালিয়ে নেব কোন রকমে।" তা সে কথা কিরণ রেখেছে। দুঃখে কষ্টে ম্যাট্রিক পাস করেছে সে। তারপর স্কুলের মাস্টারমশাইদের পরামর্শে ওভারসীয়ারী স্কুলে ভর্তি হয়ে গেল। চার বছর পরে যখন

সে বেরিয়ে এল, তখন আর সে ছোটখাট কিরণ নয়—একেবারে জবরদস্ত কম্পাসবাবু। পি, ডবলিউ, ডি-তে চাকরী পেয়ে যখন আবার ওরা—মা ছেলে পাশাপাশি সোজা হয়ে দাঁড়াল সেদিন গ্রামের লোকেও বলল—"বাহাদুর ছোক্‌রা!" কিন্তু কিরণের চাকরীতে যেদিন রাজপুরে যাওয়া সাব্যস্ত হল, সে বেঁকে বসল মাকে আর এখানে রেখে যাবে না, সঙ্গে নিয়ে যাবে। মায়েরও আপত্তি ছিল না—অরুণেরও আর গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা চলবে না—ক্লাস সেভেনে উঠল, এবার টাউনে গিয়ে হাইস্কুলে ভর্তি হওয়া দরকার। কিরণের কর্মস্থল রাজপুরে অল্পভাড়ায় একটা বাসা ভাড়া করে নিয়ে এল মাকে, অরুণ ভর্তি হল হাইস্কুলে। সাত বছর পর আবার স্বামীর জন্য নূতন করে কাঁদলেন ইন্দুবালা। পড়াশোনায় ভাল ছেলে ব'লে, আর ছেলেমহলে দুষ্টামির ফলে শীগ্‌গিরই অরুণ সকলের প্রিয় হয়ে উঠ্‌ল। ফুটবল খেলায়, গাছে চড়ায়, সাঁতার কাটতে, ছুটির দিনে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াতে অরুণের জুড়ি ছিল না। কাজেই কম্‌লির সঙ্গে সহজেই তার ভাব হয়ে গিয়েছিল, কম্‌লি তখন সবে স্কুল যেতে আরম্ভ করেছে, ক্লাস থ্রী না ফোর এ পড়ছে ক্লাসের মেধাবী ছাত্রী বলে ইতিমধ্যেই কম্‌লি নাম কিনে ফেলেছে। একদিন অরুণের দূরসম্পর্কীয়া দিদি বলে ছিলেন, বেশ মানায় দুজনে, আর কি ভাব! সেদিন মানে বুঝতে পারে নি কমল কিন্তু অরুণের মা বলেছিলেন, বড় হোক মেয়েটা লেখাপড়া শিখুক, বেশ মিলবে অরুণের সঙ্গে।

টপাটপ্‌ ক্লাস ডিঙ্গিয়ে অরুণ যেদিন স্কলারশিপ নিয়ে

রাজপুর হাইস্কুল থেকে বেরিয়ে এল সেদিন কম্‌লি কলকাতায়। শিউলীর চিঠিতে খবর পেয়েছিল। তখন তার মনে হয়েছিল অরুণ পুরুষ বলেই না অমন স্বচ্ছন্দে নিজের পছন্দ মত পথ বেছে নিতে পারল? না হলে সেওত পড়াশোনায় ভাল ছিল, প্রত্যেক বারই প্রথম হয়ে ক্লাসে উঠেছে তার একটা বছর নষ্ট হল শুধু পারিবারিক কারণে। রাজপুর থেকে কলকাতায় এসে একটা বছর তাকে নষ্ট করতে হল, কেন সে রাজপুরেই থাকতে পেল না? তাহলে ত এমনি করে সে পিছিয়ে পড়ত না। অথচ ছোড়দা, সেজদারা দিব্যি রাজপুর থেকে পাসটাস করে সুযোগ করে নিল। না হয় হলই ওরা কম্‌লির থেকে ছয়সাত বছরের বড়, বড় বলে ত ওদেরই বেশী দায়িত্ব নেবার কথা—তা না হয়ে সে মেয়ে বলে তার উপরই পড়ল যত সংসারের চাপ, রাজপুরের শান্ত পরিবেশ ছেড়ে এই শহর নামে বাজারে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল জৌলুস বাড়াবার জন্যে। অরুণের সাফল্যে ঈর্ষ্যা হয়েছিল কম্‌লির, সঙ্গে সঙ্গে-- আগে সেটা সমীর শিশির-এর বেলা বুঝতে পারেনি—গোটা পুরুষ জাতটার উপরই রেগে গিয়েছিল সে।

ঈর্ষ্যা তার আজও হয়। অরুণ এবার স্বাবলম্বী হয়ে গিয়েছে, কারও উপর তার নির্ভর করতে হবে না। সমীর শিশির ত আগেই পাস করে নিজেদের পথ করে নিয়েছে আর সে কিনা এখনও সবে কলেজের কথা ভাবছে, তাও শুধু সেই ভাবছে আর কারও কোন মাথাব্যথা নেই। বরং বাবা আর মামামামীদের নজর যেন হাঁড়ি ঠেলায় ঢোকাবারই

দিকে। সেদিন যে চাঁপা বলে গেল হাঁড়ি ঠেলতে হবে, সত্যিই কি তাই তার জন্য অপেক্ষা করে আছে? সে যদি এতদিনে অন্ততঃ বি, এ-টা পাস করত সমীর, শিশির-এর মত তাহলেও না হয় কোন কাজ নিয়ে চলে যেতে পারত, এদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে। কিন্তু বাবা? তিনি যে দারুণ দুঃখ পাবেন, ভাববেন শহরে থেকে থেকে কম্‌লির কাছে আর বাবার কথার কোন দাম নেই? তাহলে কি করা যেতে পারে, নীরবে নতমস্তকে দেবে নাকি স্রোতে গা ভাসিয়ে? হায় রে কেন সে আরও তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠল না- ঐ ত অরুণ কেমন সুন্দর ডাক্তার হয়ে গিয়েছে, রোজগার করুক না করুক নিতান্ত অসহায় ত আর নয়—শিশির, সমীর দিব্যি চাকরী জুটিয়ে নিয়েছে—হতাশা আর দারুণ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কমল ভুলে গেল যে বয়সটা তার নিতান্তই কম, সমীর শিশির আর অরুণ তার থেকে অন্ততঃ ছয় সাত বছরের বড়, আর ওরা কেউই ম্যাট্রিক পাস না করে একলাফে বি, এ, অথবা ডাক্তারী পাস করতে পারে নি। বয়সের তুলনায় চিন্তার ধারা তার অতিরিক্ত প্রবীণ তাই ভাবপ্রবণতাও তাকে মাঝে মাঝে এনে দেয় সীমাহীন বিরক্তি। সেদিন ত সবাই এসেছিলেন এবাড়ী কথায় কথায় কমলের পরীক্ষার আর তার পড়াশোনার কথাও উঠেছিল। দেবীপ্রসাদ বলেছিলেন, "কম্‌লি ত পরীক্ষায় বেশ ভালই করেছে বলছে—ওর ত ইচ্ছা আই, এস সি পড়ে কিন্তু আই, এস সি. পড়েই বা কি করবে ভেবে ত পাই না।"

বড় মামা এসেছিলেন সেদিন—বললেন, "মেয়েটার যে রকম মাথা, ডাক্তারী পড়াতে পারলে বেশ হত। আমাদের দেশে মেয়ে ডাক্তারের বড়ই অভাব, বিশেষ করে অস্ত্র-চিকিৎসকের—কম্‌লি বেশ বেপরোয়া মেয়ে, পারবে নিশ্চয়ই।"

ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন বড়মামী, "ডাক্তারী পড়াবে না আরও কিছু! বলি রায়মশাইকে কি মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না নাকি? ডাক্তারী পড়লে ও মেয়েকে কে আর বিয়ে করবে শুনি? একে ত ঐ চেহারা, আরও বুড়ো হলে পর কে ঘরের বৌ করতে চাইবে মেয়েকে?"

আবহাওয়া লঘু করার জন্য দেবীপ্রসাদ বললেন, "তাহলে তোমরাই দেখেশুনে একটা সম্বন্ধ আন, আমারত জানই, হাত পা চলছে না আজকাল, ওর মায়ের বড় ইচ্ছা ছিল কম্‌লি লেখাপড়া শেখে এই আর কি! আর বড় গিন্নী যা বললেন তাও ঠিকই, আর আমি না থাকলে বিয়ে দেবার ভারটাও ত তোমাদের উপরই পড়বে।"

গম্ভীর হয়ে উঠেছিল অণিমার মুখ, "সে কথা বলা হয়নি, আপনার মেয়ে, আপনার যা খুশী করবেন। তবে ঝক্কিটাত আমাকেই পোহাতে হবে, হয়ও, তাই বলা। এই এখন ত আর ওরা আমার কাছে থাকে না অথচ আমাকে ত রোজ হাঁটতে হয় মেয়ের তত্ত্বতদ্বির করতে। আর, একটার পরে ত আর একটা আছে, সেটাও আর বছর ছয়েকের মধ্যেই বড় হয়ে উঠবে।"

অন্যমনস্কের মত জবাব দিয়েছিলেন দেবীপ্রসাদ, "সেকথা

সত্যি বৌঠাকরুণ, তবে মলিকে ভাবছি এর পর রাজপুরেই রেখে দেব ওর শরীরটা মনে হচ্ছে কলকাতায় সহ্য হচ্ছে না। এখানে মাতঙ্গিনী আছে আর আমিও আজকাল বড় বেশী বা'র হই না, অসুবিধা হবে না।"

মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিলেন অণিমা, "আপনার মেয়ের ত ঠিকমত যত্ন করতে পারি না আমরা তাই। আর যদি কথা তুললেন ত বলি, মেয়ে দুটি আপনার কম নয়, ছোটটা ত একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, বড়টা তবু মুখে কিছু বলে না। কিন্তু থাকগে বলেই যা আর কি হবে, আপনাদের সমাজে এরাই হয়তো আদর্শ।"

খোঁচাটুকু নিঃশব্দে হজম করলেন দেবীপ্রসাদ। অণিমা আর তুষারিকা তাঁর বাড়ীতে অতিথি তার উপর শ্বশুরবাড়ীর কুটুম্ব। দশবছরের মলি আর পনের বছরের কম্‌লির ব্যবহারে তারা এত বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, দরকার কি ওদের আর বিব্রত করে। তাদের আর সেখানে পাঠাবার ইচ্ছা নেই তার। কেতাদুরস্ত আদবকায়দা নাই বা শিখল, মলি কম্‌লির অন্তঃকরণটা ছোট হয়ে যাবে না। পরের কথা কিছু ভাবতেও শিখবে—পরকে দরদ দিয়ে আপনার করতে না পারলেও পরমতঅসহিষ্ণু হবে না ওরা এখানে থাকলে।

দশ

অনেকদিন থেকে অরুণের মা পীড়াপিড়ি করছেন ছেলেকে বিয়ে করবার জন্য, প্রথম প্রথম সে হেসেই উড়িয়ে দিত। কিরণও তেমন গা করেনি এতদিন। এবার অরুণ পাস করে রাজপুরে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে কিরণও যেন একটু সচেতন হয়ে উঠল। রেখাকে দিয়ে কথাটা তুলল সে অরুণের কাছে, হেসে উড়িয়ে দিল অরুণ—"দাঁড়াও এইত সবে পাস করলাম এখনও খরচটাও তুলতে পারলাম না, এরি মধ্যে আবার খাবার লোক বাড়াতে চাও? সময় কই আমার বিয়ে করার মত?" তা সত্যি, সময় নেই কথাটা নয় অবসর অপর্যাপ্ত সে কথাটা সত্যি আয় এখনও আরম্ভ হয়নি সে কথাটাও সত্যি। নূতন ডাক্তার—কথায়ই বলে শতমারী না হলে বৈদ্য হয় না—তায় পরিচিত পাড়ার ছেলে, লোকে তাকে বড় একটা ডাকে না। তাই হয়, যা আমাদের নিতান্ত চোখের সামনে, তার যেন মূল্য বা কদর আমরা সহজে বুঝি না। যে আমাদের হাতের উপর বড় হয়ে উঠল সে আজ এত বড় হয়ে উঠেছে যে তার উপর আমাদের জীবনমরণ নির্ভর করছে তা আমরা সহজে স্বীকার করতে চাই না। তাই গেঁয়ো যোগী ভিখ পায়না—তাকে যেতে হয় গ্রামান্তরে।

অরুণের হাতে তাই অখণ্ড অবসর। পাড়ার ফুটবল ক্লাবটার তদারক করে, সাঁতারের কম্পিটিশনের ব্যবস্থা করে,

বন্ধুবান্ধবের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে আর অবসর সময়ে বিনা-পয়সায় রোগী দেখে ওষুধ কিনে দিয়ে সময় কাটছিল তার। মায়ের অভিযোগ আর অনুযোগ' কানে যেত তার ঠিকই, কিন্তু তেমন আগ্রহ ছিল না তার তাতে। এবার শুধু কিছু-দিন আগে চাঁপার কাছে কমলের খবর পেয়ে মনটা তার অশান্ত হয়ে উঠেছে। ম্যাট্রিক দিয়ে কমল রাজপুরে এসেছে। কতকাল তার সঙ্গে দেখা নেই। ছুটিছাটায় অরুণ এসেছে বাড়ী, কিন্তু কমলের সঙ্গে দেখা হয়নি। মামার বাড়ীতে থেকে সে নাকি একেবারে বদলে গিয়েছে বলেছিল অমল আর মালতী। শহরের প্রচণ্ড শাসনে সে যে ক্রমশঃ আপাত-গম্ভীর হয়ে উঠেছে সে খবর মালতীর জানবার কথা নয়। কাজেই কার্যকারণ সম্বন্ধ না খুঁজে সে শুধু—ফলাফল বিচার করেছে। তারও ত কিছুটা ঈর্ষ্যা হয়েছিল কম্‌লির বিরুদ্ধে। একসঙ্গের খেলার সাথী, একই সঙ্গে পড়াশোনা করেছে না হয় বয়সে কম্‌লি তার থেকে দুয়েক বছরের ছোট-ই হবে, তাই বলে কোথায় সে শ্বাশুড়ীর মুখনাড়া শুনে সংসার করছে, বাড়ী থেকে বার হয়ে পুবপশ্চিম দেখার সুযোগ নেই আর কম্‌লি কিনা শহরে থেকে পড়াশোনা করে তাদের থেকে কত বড় হয়ে উঠল। আর শহরও কি যে সে শহর যার নাম কলকাতা, গোটা বাংলাদেশের রাজধানী! আর সেই শহরের ছোঁয়াচ লেগেই না কম্‌লি পাড়ায় বেড়াতে আসে না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিবিটি সেজে সারাদিন ঘরের কোনে বসে শুধু বই পড়ে। ওর আর জাত নেই অমন

'বাবু' মেয়েকে কে চায় দলে নিতে! সেত আর রাজপুরের সেই দস্যি কম্‌লি নয়—সে যে এখন কলকাতার কমলরাণী! এই সবই কানে পৌঁছেছে অরুণের, সেও ভেবেছে কি আশ্চর্য, সেই কমল! লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি ছাড়া আর কিছু চাইত না যে তার এই পরিবর্তন! তা হবে, শাস্ত্রকাররাই ত বলে গিয়েছেন, "স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্"—

কিন্তু কমলের সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধধারণা পোষণ করতে কেমন যেন বেদনা বোধ হয় অরুণের। শৈশবের সঙ্গী আজ রূপান্তরিত হয়েছে যৌবনের প্রিয়াতে। কবে কেমন করে কমলকে সে স্থান দিয়েছে অন্তরের অন্তঃস্থলে তা সে জানেনা, সে দিনক্ষণ মনে নেই তার। শুধু মনে আছে, যেদিন সে প্রথম আবিষ্কার করল জীবনসঙ্গী হিসাবে কমলকে চাই তার সেদিনের দুঃসহ সুখানুভূতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল সুগভীর লজ্জা। আবিষ্কারের পুলকে সে ঠিক করেছিল এই একান্ত গোপন কথাটি সে কাউকে জানাবে না। একমাত্র কমলের কাছেই প্রকাশ করবে একদিন। অরুণ নিজেকে পাহারা দিচ্ছিল বন্ধুবান্ধব আর মা বৌদির কাছ থেকে, কিন্তু বিপদ্ এল সম্পূর্ণ অন্যদিক দিয়ে। সেদিন সে চাঁপাকে দেখ্‌তে পেয়ে জিজ্ঞেস করল—"কেমন আছ চাঁপা?"

"ভাল আছি অরুণদা, আপনি ভাল আছেন?"

"বেশ ভালই আছি। তোমাদের সব কি খবর?"

"আর কই খবর?" নিজের বিয়ের খবরটা আর লজ্জায়

বলতে পারেনি সে—"এখন ত জোর খবর হল কম্‌লি ওর মামীদের সঙ্গে রাজপুরে থাকতে এসেছে।"

হঠাৎ কেমন লাল দেখাল অরুণের মুখ। এই কথাটাই সে জানতে চাইছিল কিন্তু কে জানে কেন জিজ্ঞেস করতে পারেনি, কে যেন তার মুখ চেপে রেখেছিল। কম্‌লির নামোল্লেখে সে লজ্জা পেল, কিন্তু সে লজ্জা ঢাকতে গিয়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, "কমলরা এসেছে বুঝি? সে ভাল আছে?"

"এমনি ত ভালই আছে। তবে শহরের চাপটা তেমন সহ্য করতে পারেনি বলে বেজায় গম্ভীর হয়ে গিয়েছে।"

"কি হয়েছে তার চাঁপা"—অরুণের ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে বিস্মিত চাঁপা মুখ তুলে তাকাতেই অপ্রতিভ হয়ে গেল সে। তাড়াতাড়ি সে ভাব চাপা দিয়ে বলল আবার, "শুনেছি সে খুব শহুরে হয়ে গিয়েছে। তা আমাদের কথা আর তার মনে আছে কি?"

"কি যে বলেন, মনে কি আর নেই? স্বভাবটা একটুও বদলায়নি, তবে গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। বেচারা যা শাসনে থাকে।"

"বলো না চাপা আমাদের দিকে আসতে। দু'চারটা শহরের কথা শুনব আমাদের ত আর মামার বাড়ী নেই, কলকাতা শহরটা ভাল করে দেখিনি, কবে গিয়েছিলাম।"

চিন্তিতের সুরে বলেছিল চাঁপা—"বলব!" কিন্তু অরুণের এই আগ্রহ তাকে বিস্মিত করছে, কেন এই ব্যাকুলতা?

এগারো

ইতিমধ্যে একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অরুণের ডাক এল কম্‌লিদের বাড়ী থে..ক। মলির শরীরটা কিছু-দিন থেকেই ভাল যাচ্ছিল না, এবার সে একেবারেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। সারাশরীরে ব্যথা, আর অবিচ্ছেদী জ্বর। কিছুদিন দেখার পর পারিবারিক চিকিৎসক রায় দিলেন রোগটা টাইফয়েড। তখনকার দিনে টাইফয়েডের কোন সুনিশ্চিত চিকিৎসা ছিলনা, সেবা-ই নাকি ছিল এর ঔষধ, রোগীকে যথাসাধ্য আরামে রাখা। তবে বাপ মা কিছু আর পীড়িত সন্তানকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখতে পারে না। তাই মনকে চোখ ঠারার জন্যে ডাক্তারকে ভিজিটও দিতে হয়, ওষুধও খাওয়াতে হয়। মলির সেবাশুশ্রূষার জন্য সারাদিন রয়েছে কমল, পথ্য যোগাচ্ছে মাতঙ্গিনী, দেখা-শোনা করার ভার বড়মামীর উপর। ছোটমামী এসে ভার নিয়েছে ঘরসংসারের সঙ্গে নিজেদের ছেলেপুলেরও। দেবী-প্রসাদ একটা চেয়ারে বসে থাকেন কেমন যেন আত্মসমাহিতের মত। দুরারোগ্য টাইফয়েড্, কি হবে তিনি ভাবতেও পার-ছেন না। আবার ভাবছেন যদি ভালও হয়—একটা অঙ্গ হানি ত হয়েই থাকবে চিরকাল। মলি তার মায়ের বড় আদুরে ছিল, তাই কি সে তাকে ডেকে নিচ্ছে, না কি অনাদরে শুকিয়ে যাচ্ছে মল্লিকা! এমনি কত কথাই যে মনে হচ্ছিল তাঁর।

স্নেহ পাপাশঙ্কী একথা সত্যি, কিন্তু তারও উপরে বোধহয় অনাগত ঘটনার ছায়া পড়ে মানবমনে পূর্বাহ্ণে, না হলে টাইফয়েডে আরোগ্যও ত হয় লোক, দেবীপ্রসাদ শুধুই বিপদের ছায়া দেখছেন কেন? হঠাৎ তাঁর মনে হল অরুণ ত রয়েছে পাশেই, তাকে ডেকে এনে ভার দিলে হয় না! আমাদের চেয়ে অরুণ এর যত্ন নিশ্চয়ই ঠিকপথে চালাবে।

সঙ্কটকালটা কেটে গিয়েছে। অণিমা রোগীর পথ্য নিয়ে এসে দেখল মলি ঘুমিয়ে পড়েছে, মুখে তার প্রশান্ত দৃষ্টি, রোগের যন্ত্রণার উপশম হয়েছে এবার, কপালে হাত দিল আস্তে, জ্বর যেন ছেড়ে গেছে মনে হল তার, মাথার কাছে টুলে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল অরুণ, বড়মামীর সাড়া পেয়ে বলল নিঃশব্দে,—"একটু কম আছে।" পাশের ঘরে হঠাৎ কমল চেঁচিয়ে উঠল 'মা' চমকে উঠল অরুণ— মামী ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে গেলেন "কি রে অমন চেঁচালি যে"—

"মামীমা এই মাত্র স্বপ্ন দেখলাম মা এসেছে মলিকে নিয়ে যেতে।"

"সে কিরে! কি যা তা বকছিস্! আমি রয়েছি সামনে, এত করে সেবা করছি। এতটুকু থেকে মানুষ করে তুললাম, আর আজ নিয়ে গেলেই হবে! একি আর কারো সেবা নাকি যে খুঁত পাবে! ভাবিস্না, টাইফয়েড রোগীর আসলই হল সেবা, সে কি আর তোরা পারিস্। এই ত মলি আগের চেয়ে অনেক ভাল আছে—শুধু আমি ছিলাম তাই··· ······"

অণিমার কথা শেষ হতে পেল না—অরুণের আর্তকণ্ঠ শোনা গেল—“মামীমা, কম্‌লি শীগগির এস…………”

ঊর্ধ্বশ্বাসে কম্‌লি ছুটল সে ঘরে ; তখনও মলির মুখে মৃদু হাসির রেখা মিলিয়ে যায়নি, দেবীপ্রসাদ বজ্রাহতের মত বসে রয়েছেন মাথায় হাত দিয়ে, অরুণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে মলির শিয়রে। তার দিকে তাকাতেই অরুণের অদ্ভুত দৃষ্টির অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেল, চোখে অন্ধকার দেখে স্থানকাল- পাত্র ভুলে আছাড় খেয়ে পড়ল সে মলির বুকের উপর—“মলি রে…………”

বারো

দেবীপ্রসাদ সকলকে একত্র করেছেন। বড় দুইছেলে ছুটি নিয়ে এসেছে, সমীর, শিশিরও বাড়ীতে আছে, কাঞ্চন এসেছে শ্বশুরবাড়ী থেকে। মামীরাও আছে—আছে সবাই—নেই শুধু মলি। সারা বাড়ীটা নিঝুম। কমলের পাসের খবর বেরিয়েছে, স্কলারশিপ পেয়েছে সে, কিন্তু মনে হতেই দু'চোখ ছাপিয়ে জল আসে তার। একসঙ্গে দুজনে স্কুলে যেত, একসঙ্গে খেলা, একত্রে ঝগড়া, সবই মনে পড়ছে তার। হায়রে সে এখন একা, এতবড় পৃথিবীতে একেবারে একা। চেহারা তার এরমধ্যেই শুকিয়ে উঠেছে। সকলেরই দৃষ্টি এবার তার উপর।

পরীক্ষার খবরটা কমলের ভালই বলতে হবে। শোনা যাচ্ছে সে নাকি তাদের জেলায় প্রথম হয়েছে। এবার সে স্পষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করল, সে পড়বে। জেলায় বিরাট কলেজ রয়েছে। সেখানে বোর্ডিংএ থেকেই সে পড়বে। খরচ চালিয়ে দেবে নিজেই, কলেজে মাইনে ত লাগবেনা তার—স্কলারশিপের টাকার সঙ্গে সামান্য কিছু টাকা যোগ করলেই বোর্ডিংখরচও উঠে যাবে। এত হিসাব করার প্রয়োজন ছিলনা। তাকে বোর্ডিংএ রাখার খরচ বহন করতে দেবীপ্রসাদের অসুবিধা হবার কথা নয়। আসল আপত্তি ছিল তাঁর রক্ষণশীলতা, সেটাও যেন ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে

স্নেহের অধিকারে। বিশেষতঃ মলির মৃত্যুতে শোকার্ত দেবীপ্রসাদ কিছুটা ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন কমলের প্রস্তাব। মামীরা মুখ বেঁকিয়ে রইলেন নিঃশব্দে, যে মেয়ের উপার্জনের জোর আছে তার কথারও খানিকটা দাম দিতে হয় তারা মানেন—তাই বলে যা ইচ্ছে তাই করবে? বাড়ী থেকে কলেজ যাওয়াআসা করার থেকে কিন্তু এই ব্যবস্থাই ভাল মনে হল অন্য সকলের। কড়া পাহারায় থাকবে—মেয়েদের বোর্ডিংএ আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে মিশতেও পারবে।

তবুও বাড়ীর নিরানন্দ ভাব গেল না, যে উৎসব জমে উঠতে পারত কমলের বিজয়গর্বকে ঘিরে তা ঢাকা পড়ল মলির অভাবজনিত বিষাদে। এরইমধ্যে একদিন যাবার সময় ঘনিয়ে এল কমলের। ভাইবোনরা সকলেই কমলের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে কাঞ্চন ত বলেই ফেলল—'বাবাঃ! কম্‌লির মত মেয়ে বলেই পারল অমন ফল করতে। আমার কপালে ত আর হলো না। তবু কম্‌লির হলে লোককে বলতে পারব আমার বোন্ দেখ কি সাংঘাতিক মেয়ে। নারে কম্‌লি তুই পড়া চালিয়ে যা। বিয়ে হলে ত সেই জাঁতাকলে ঢুকতে হবে আর পঞ্চাশজনের মনোরঞ্জন করতে করতে দিন যাবে, তার চেয়ে এ ঢের ভাল। আমি ত কতবার চেষ্টা করলাম ম্যাট্রিকটা দেব—একটা না একটা অসুবিধা লেগেই থাকে। এক একসময়ে মনে হয় যাই সব ছেড়েছুড়ে একদিকে চলে। শ্বশুরবাড়ীর লোকে যে আমাকে

কি ভালই বাসে, আমাকে ছাড়া তাদের একদণ্ড চলেনা। তাই বাপের বাড়ী আসবার নামেই ওদের মুখ শুকিয়ে যায়, আর পরীক্ষা দেব!"

কমল হেসে ফেলল, "তা দিদি তোমায় যখন তারা এতই ভালবাসে ওদের শুদ্ধ নিয়ে এলেই ত পার, তাহলেই ওদের কাজকর্ম আর নিজেদের করতে হয় না।"

কাঞ্চনও হেসে ফেলে নিজের রসিকতায়, "তা বলেছিস্ মন্দ নয়, তা সেদিকে আবার ওদের টনটনে জ্ঞান। ওদের ছেলে এখানে এসে বেশীদিন থাকলে কিজানি যদি আবার শ্বশুরবাড়ীর দিকে টানটা বেশী হয়ে যায়—কিংবা নাতিনাত্নী, তারা ত আমারই ছেলেপুলে—পাছে মামাবাড়ীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যায় তাই তারাও আসতে পারবেনা। আমি যতবারই আসি, দেখিস্না শুধু একটি দুটিকে নিয়ে আসি!"

"তা তোমার যদি নিজের ছেলেপুলের উপরও কোন অধিকার নেই, কিছু বলনা কেন? জামাইবাবু ত তোমার হয়ে দু'কথা বলতে পারে?"

"ওরে বাবা, তোর জামাইবাবু! জানিস্না ছেলেরা বিয়ে করার সময় থাকে রামচন্দ্র, বাবার কথার উপর কথা বলতে পারে না; আর বিয়ে হয়ে গেলে পর একেবারে যুধিষ্ঠির! মায়ের কথায় তারা পাঁচ ভাইয়ে এক মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। তা ছাড়া স্ত্রীর হয়ে লড়তে গেলে লোকে স্ত্রৈণ বলবে না! পুরুষমানুষের এর চেয়ে বড় অপবাদ আর আছে নাকি! আর আমার কথা বলিস্ যদি—এত গোলমাল

হয় কথা দু'একটা বললে যে সে অশান্তির ধাক্কা সামলানোর চাইতে মুখ বুজে থাকা ঢের ভাল। তা হোক্ সে কবরের শান্তি, স্বস্তিত বটে!"

"কিন্তু দিদি সকলের প্রতি মেয়েদের কর্তব্য আছে শুধু নিজের প্রতিই কি নাই?"

"নিজের প্রতি কর্তব্য ততক্ষণই করতে পারিস্ যতক্ষণ না অন্যের স্বার্থে ঘা লাগে। আমাদের দেশের মেয়েদের তুলনা করা হয় সর্বংসহা ধরিত্রীর সঙ্গে। আমরা বাস করি পুরুষের সমাজে। তাদের অর্থে ভাতকাপড় পেয়ে বেঁচে থাকি মাত্র, তাই আমাদের খাটতে খাটতে মুখে রক্ত উঠে যদি মরেও যাই বড়জোর লোকে বলবে মেয়েটা কর্তব্য করতে পিছ পা হয়নি। কিন্তু পুরুষ মরে গেলে বলবে হায় হায় কি সর্বনাশ হল! সংসারটা একেবারে ভাসিয়ে দিল। পাঁচজনের জন্য কত দরদ, সমাজের কি ক্ষতি হল! মেয়েদের দুঃখের কথা আমাদের সমাজে কেউ ভাবে ভেবেছিস্!"

"কিন্তু দিদি মেয়েরাই ত আমাদের দেশে অনেক সময় মেয়েদের দুঃখ দেয় বেশী। অনেক পুরুষ ত উদারতার বশে মেয়েদের অনেক উপকারও করে। বিদ্যাসাগর, বেথুন, রামমোহন এঁরা ত মেয়েদের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে গিয়েছেন।"

"তাঁরা পুরুষ নন রে কম্‌লি, তাঁরা মহাপুরুষ একথা কখনও ভুলে যাবি না। সাধারণ নারী আর সাধারণ পুরুষের কথা যদি ধরিস্ দেখবি মেয়েদের স্বাধীন সত্ত্বায় পুরুষের

বিশ্বাস নেই। অনেকে বাইরে বক্তৃতা করতে ভালবাসে, কিন্তু নিজের স্ত্রী বা বোন্ অথবা মায়ের বেলায় অত উদারতা থাকেনা। আর মেয়েরা দুঃখ দেয় একথা সত্যি, তবে চির-কাল ধরে তাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে সংসারে যত অনর্থের মূল নারী, মেয়ে কোন কাজে লাগেনা এমন কি বাপ মা মারা গেলে মেয়েদের মুখে আগুন দেবার অধিকার পর্যন্ত সঙ্কুচিত। জানিস্ ত দশচক্রে ভগবান্ ভূত হয়, কাজেই চিরকাল ধরে শুনতে শুনতে আমরাও শিখে ফেলেছি আমরা শুধু অন্ন ধ্বংস করি, অন্ন প্রস্তুত করার কাজে লাগি না।”

“কি যে বল দিদি, আমি নিজে চাকরী করব। দেখো দিদি ঐ রকম যদি সংসার করতে হয়, তাহলে আমার সঙ্গে ঝগড়া লেগে যাবে। তার চেয়ে আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভাল।”

“সত্যি ভালরে কম্‌লি। আমি ত তোরই দিদি, চাইব স্বামীপুত্র নিয়ে সুখেস্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কর। তবে উপযুক্ত হবার আগে নিজে না জেনে যেন কখনও মোহে পড়ে বিয়েতে মত দিয়ে দিস্ না। বিয়ে করে সংসারের আবর্তে একবার ঢুকে পড়লে সাধারণতঃই আর কিছু করা মেয়েদের পক্ষে সম্ভব হয় না।”

“কিন্তু বাবাকে বোঝাবে কে?”

“আমিই বলব। তবে এত কথাত বলতে পারব না, বললে ভাববেন আমি খুব দুঃখে আছি, সে ভারী লজ্জার কথা হবে। ভাত কাপড়ের কষ্ট ত আর সত্যিই নেই, আরও

অনেক মেয়ের কাছে আমার কষ্টের কারণগুলো হাসির ব্যাপার বলেই মনে হবে। বলবে মনগড়া কতগুলো কথা নিয়ে শুধু শুধু দুঃখ সৃষ্টি করে চলেছি। কিন্তু তুই নিশ্চয়ই বুঝবি আমি কি বলতে চাইছি, বাবা হয়ত বুঝবেন না। তাই তাঁকে বলব যাতে তোকে আরও অনেকখানি পড়ান তুই যেন আমাদের অপূর্ণ কামনা পূর্ণ করতে পারিস্। একটা মানুষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সংসারের আত্মীয়স্বজন সকলের মনোরঞ্জন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে, অনেক সংসারে ঝি চাকর ঠাকুর সবগুলো পোষ্টই সে দখল করে আছে—তবু সে মাসান্তে মাইনে আনতে পারছে না বলে সংসারে তার কোন দাম নেই। ঝিচাকরের যে স্বাধীনতাটুকু আছে তার তাও নেই—এ অসহনীয় অবস্থা কবে দূর হবে বলতে পারিস্?”

তেরো

অরুণ শুনল কমল আবার চলে যাচ্ছে। এবার যাবে সে জেলা কলেজে বিজ্ঞান পড়তে। খুশী হয়ে উঠল সে, কমলের পড়াশোনা এগিয়ে যাক্ এ বিষয়ে তার আগ্রহও কম নয়। সত্যি করে যে মেয়ের পড়াশোনার আগ্রহ আছে তাকে কেন পড়তে দেওয়া হবে না সে ভেবে পায় না! কিন্তু হঠাৎ এই প্রশ্নের আর একটা দিক তার চোখে পড়তেই পৃথিবী অন্ধকার হয়ে এল তার সামনে। কমল আবার চলে যাচ্ছে—তার মানে তাকে পাওয়ার দিন আরও পিছিয়ে গেল। যে আশা তার মনে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে আস্তে আস্তে ডালপালা মেলতে আরম্ভ করেছিল—আবার তাকে উপড়ে ফেলতে না হোক্ সাফল্য হবে বিলম্বিত। মাঝে দু'একদিন কানাঘুষায় তার মনে হয়েছিল কমলের বাবা এবার তাকে বিয়ে দেবেন, বুক কেঁপে উঠেছিল তার, কমল পর হয়ে যাবে। ভেবেছিল একদিন তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে তার মতামত। কিন্তু যে দুয়েকদিন তার দেখা হয়েছে কমলের সঙ্গে, নিরালায় তাকে পায়নি। মাত্র চাঁপার বিয়ের দিন যখন কমলকে বাড়ী পৌঁছে দেবার ভার পড়েছিল তার উপরে, উল্লসিত হয়ে উঠেছিল সে। কিন্তু পথে পা দিয়েই কমল এমন গম্ভীর হয়ে গেল যে সে আর ভরসা করে কোন কথাই বলতে পারেনি। কিন্তু পাশাপাশি পথ চলতে কতক্ষণ আর নীরব থাকতে পারে দুজন তরুণ তরুণী, বিশেষতঃ যখন দুজনেই কথা বলার জন্য আকুলি-

বিকুলি করে মরছে। চাঁপার কথাগুলো তখনও কানে বাজছিল কম্‌লির— "অরুণদা তোকেই পছন্দ করে রে কম্‌লি"—লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠছিল তার মুখ থেকে থেকে। আবছা অন্ধকারে সরমরাঙা সে মুখ অরুণ দেখতে পেল না—চাঁপার বিবাহসভার দৃশ্যটা তার চোখের সামনে ভাসছে তখন—চাঁপার হাত হাতে নিয়ে বসে আছে চাঁপার বর অনিমেষ। রোমাঞ্চ জাগল অরুণেরও মনে—ধীরে ধীরে ডাকল 'কমল—'

সম্মোহিতের মত জবাব দিল কম্‌লি—'কি'

এবার অরুণের কথা ফুরিয়ে গেল, কি বলবে সে. কি করে জানবে যে কথা সে বলতে চায় কমল তার মানে বুঝবে কিনা! যদি তাকে ফিরিয়ে দেয়, যদি বিদ্রূপ করে উঠে তার কথা শুনে! আশা নিরাশায় দোল খাচ্ছিল অরুণ, কোনমতে বলল— "এবার কি করবে ঠিক করেছ?"

"ঠিক ত এখনও হয়নি, তবে বাবাকে বলেছি আমি আরও পড়ব। আপনি কি বলেন?"

"নিশ্চয়, আরও পড়বে বৈকি। এত ভাল ফল করে বসে থাকবে কেন?" উল্লসিত হয়ে উঠে অরুণ, কম্‌লির এই পরামর্শ চাওয়ায়। "কিন্তু কমল—তুমি যদি পড়তে চলে যাও...." থেমে যায় সে।

বিস্মিত কমল প্রশ্ন করে এবার, "কি হবে অরুণদা আমি চলে গেলে?"

সামলে নেয় অরুণ, "না, আমি ভাবছিলাম তোমার বাবার কথা। বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বেন তিনি।"

বিষণ্ণ হয়ে আসে কমলেরও মন, "তা বুঝি কিন্তু বাবা কিছুতেই এখানে থেকে কলেজ যাওয়া আসা করতে দেবেন না। বিশেষ এখানে আবার সহশিক্ষা আছে।"

"তা সত্যি। আমরা কাটিয়ে দেব কোনরকমে চারটা বছর।"

কর্তৃকারকে প্রথমপুরুষের প্রয়োগটা কমলের কান এড়ায় না—সসঙ্কোচে বলল, "ছুটিতে ত আসছিই এখানে।"

দিন কয়েক পরে। কমলের যাবার আর বেশীদিন বাকী নেই—অরুণ বলল রেখাকে, "বৌদি কম্‌লি চলে যাবে—ভাল করে পাস করল, ওকে একদিন খাওয়াও না।"

চোখতুলে তাকাল রেখা, "ব্যাপার কি অরুণ! কম্‌লি কোথায় যাবে? তুমি কি করে জানলে?"

আরক্ত হয়ে ওঠে অরুণের মুখ, "বাপ্‌রে বাপ্, জেরায় একেবারে অস্থির। পাড়ার মেয়ে ভাল করে পাস করেছে—বেচারা একদিন ফূর্তি করতে পেল না—কোথায় তোমরা ডেকে নিয়ে আসবে—না আমি মনে করিয়ে দিলাম বলে আমাকেই জেরা। যাবে সে জেলাকলেজে আই, এস, সি, পড়তে, তোমার অমনি হিংসা হল বুঝি!"

কৌতুকে উজ্জ্বল দেখাল রেখার মুখ। তবুও কৃত্রিম কোপে জবাব দিল, "তোমরা ত শুধু আমার হিংসাটাই দেখ। যাই মাকে বলি গিয়ে তাঁর গুণধর ছেলের কীর্তি।"

বারান্দার দিকে পা বাড়াতেই শঙ্কিত অরুণ বৌদির

সামনে ছ'হাত জোর করে দাঁড়াল, "দোহাই তোমার বৌদি, মা কি ভাববেন বল দেখি।"

খিলখিল করে হেসে উঠে রেখা, "আচ্ছা পাগল ত? আমি কি সত্যি বলতে যাচ্ছি নাকি যে অরুণ কম্‌লিকে ছাড়া...." আর বলতে পারল না রেখা—ততক্ষণে অরুণ রেখার আঁচলটা গুঁজে দিয়েছে মুখে। পাশে বসে পুতুলের ঘরসংসারের তদারক করছিল লীনা! চেঁচিয়ে উঠল, "এই কাকু, তুমি মাকে মারছ কেন?"

"মারব না, তোর মা যা দুষ্টু হয়েছে!"

"ও ঠাকুরমা দেখ এসে কাকু মারছে মাকে—" চেঁচাতে লাগল লীনা তারস্বরে—"তবে রে আহ্লাদী মেয়ে" বলে তাকে ছ'হাতে কোলে তুলে চুমো খেল অরুণ। বৌদির শেষ কথাটার রেশ তখনও তার কান থেকে মিলিয়ে যায়নি, চারদিকে যেন বইতে শুরু করেছে খুশীর হাওয়া—সবকিছুই আজ মায়াময়, অপূর্ব!

চৌদ্দ

বোর্ডিংএ নূতন জীবন আরম্ভ হল কমলের। পদে পদে নিষেধ আর বাধার গণ্ডী দিয়ে ঘেরা বোর্ডিংএ আনন্দ দেবার ব্যবস্থাও প্রচুর। ষোল থেকে কুড়ি বাইশ—হরেক রকমের মেয়ের রাজত্ব সেটা, বাধাকে জয় করার নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবনে পিছপা নয় তারা। অথচ কারোর সঙ্গে কারো স্বার্থের সম্বন্ধ নেই বলে বাধে না হীনসংঘাত। ভাব আর গলাগালি, মান আর অভিমান কোনটারই অভাব নেই সেখানে। কমল যেন মনের যত রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিল এখানে এসে। পড়াশোনার সঙ্গে দূর হয়ে গেল তার সঙ্গীহীনতার বেদনা। ঘরোয়া জীবন থেকে বৃহত্তর জগতে নিজেকে মিলিয়ে দেবার শিক্ষা পেল সে এখানেই।

মাঝে মাঝে যখন ছুটিতে বাড়ী আসত কমল, আরও যেন ভাল লাগত সব কিছু। মাঠঘাট, নদীবন, তাকে আকৃষ্ট করত আরও বেশী, দূরে চলে যাওয়া কমলের কাছে আজ এরা আর শুধু দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু নয়, এরা কল্পনার রঙে রঙ্গীন, তাই আরও মায়াময়। দূরে না গেলে জিনিসের সঠিক মূল্য নিরূপণ করা যায় না, নিত্যকার ব্যবহারে প্রতিটি জিনিসই ম্লান হয়ে যায়। অতিপরিচিত বস্তু বা মানুষের সঠিক মূল্য নিরূপণ করা যায় তখনই, যখন তা দুর্লভ হয়ে উঠে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে বছর ঘুরে গেল, এক এক করে পৃথিবীর বয়স এগিয়ে গেল আরও কয়টি বছর —চারবার ঝরে গেল শিমূল গাছটার পাতা,—রক্তরাঙা শিমূল ফুল পরিণত হল ফলে, ফল ফেটে বেরিয়ে এল তার শাঁস— ধীরে ধীরে কমলও পরিণত হল পূর্ণযৌবনা, স্থিরবুদ্ধি সম্পন্না তরুণীরূপে। জীবন সংগ্রামে নামবার মত মোটামুটি পাথেয় সঞ্চয় হয়েছে তার। সে আজ বিজ্ঞান-স্নাতক।

যেদিন বি, এস, সি পরীক্ষার ফল বার হল, দেবীপ্রসাদ তখন ওপারের ডাকে প্রহর গুণছেন। মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন, "তোর মায়ের শেষ ইচ্ছা আমি পূর্ণ করেছি কম্‌লি। পরপারে গিয়ে আর তার কাছে আমাকে জবাবদিহী করতে হবে না। তোকে বিয়ে দিয়ে যেতে পারলাম না বলে আর আমার দুঃখ নেই, আশীর্বাদ করি সত্য চিনতে যেন তোর ভুল না হয়।"

চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছিল কমলের, রুদ্ধকণ্ঠে সে বলেছিল, "আমার জন্যে তুমি ভেবো না বাবা, আমার পথ আমি নিজেই করে নিতে পারব।"

মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের শেষ মুহূর্তটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আশার আলোকে। সূর্যকিরণের মত সত্য উদ্ঘাটিত হল তাঁর সামনে, কম্‌লি সাবালিকা হয়েছে, কম্‌লি বি, এ, পাস করেছে, তাঁর বংশের আর কোন মেয়ে এর আগে বি, এ, পাস করেনি। রক্ষণশীল সমাজের একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারের কর্তা ছিলেন তিনি, তবু আজ তাঁর আনন্দের সীমা নেই। তাঁর মেয়ে হয়ে কম্‌লি

নেবে নিজে পথের সন্ধান করে, তার জন্য কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই আর তাঁর। নূতন যুগের সূচনা দেখতে পেয়েছেন তিনি ; পূর্বদিগন্তে নব অরুণোদয়ের আভাস, পশ্চিমে যাক্‌না মিলিয়ে অতীত দিনের শেষ চিহ্নটুকু ! ক্ষোভ দুঃখ, আশা নিরাশা নিয়ে বিলীন হয়ে যাক্ হিমঋতু--আসুক নববসন্ত নব পত্রাবলীতে সমৃদ্ধ হয়ে।

দ্বিতীয় খণ্ড

সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না, সূর্যের উদয়-অস্ত তোমার আমার দুঃখের ব্যথায় ভারী হয়ে মন্থরতর হয় না, পৃথিবী চলে এগিয়ে, কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে প্রিয়পরিক্রমা তাকে যে শেষ করতেই হবে। দিন তাই কম্‌লিদের বাড়ীতেও কেটে চলল, এক দুই করে দেবীপ্রসাদের মৃত্যুর পর অনেকদিনই ত কেটে গেল, তা প্রায় দুইমাস হবে। চোখের জল মুছে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হবে এবার। পরিণত বয়সে পিতামাতা বিদায় নেন সকলেরই কিন্তু এরও চেয়ে কঠিন পরীক্ষা আসছে তার সামনে। তাকে নিজের হাতে করতে হবে জীবনপথের সন্ধান।

এবার মন স্থির করে ফেলল কমল। অরুণের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া তার না করলেই আর চলবে না। প্রিয়জনকে আঘাত দেওয়া যায় না অথচ আঘাত না দিলে সত্যও উদ্‌ঘাটিত হয় না। কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে, কোন্ অসতর্ক কথায় যে সে তাকে ব্যথা দিয়ে বসবে, ভাবতেও কমলের অন্তরে জাগে বেদনাবোধ। অথচ অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। একদিন তাকে অরুণের মুখোমুখী হতেই হবে তা সে জানত, কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলাই ভাল। এখন তার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুটা পরিণত হয়েছে, তর্কে অনাবশ্যক উত্তেজনার বদলে এসেছে যুক্তির ছোঁয়াচ

আশা করতে পারে অরুণের সঙ্গে আলোচনায় তাকে বোঝাতে পারবে তার মনের কথা।

অরুণদের বাড়ী যখন গিয়ে পৌঁছল সে বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে। অরুণের মা ইন্দুমতী বারান্দায় বঁটি পেতে তেঁতুলের বীচি ছাড়াচ্ছিলেন। কমল গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই বললেন, "এস মা এস। মা যেন আমার সাক্ষাৎ সরস্বতী। যার ঘর আলো করবে তার জন্য হিংসা হয় আমার।"

আরক্তমুখে দাঁড়িয়ে রইল কমল। আবার বললেন ইন্দুমতী—"কম্‌লি, এত অল্প বয়সে তোমার বাপমা দুইই মারা গেলেন বলে দুঃখ কোরো না। সংসারে বাবা-মা কারো চিরদিন থাকে না, এখন তোমার বড় ভাইরা রয়েছে, বোন আছে তোমার ভাবনা কি? তোমার মা ত চাঁদের হাট বসিয়ে গিয়েছে, দেখে যেতে পারল না এই যা দুঃখ। আর আমরা দেখ সংসারের কোন কাজে লাগি না, বিধবা বুড়ী ছেলেদের ভারবোঝা হয়ে এখনও দিন গুন্‌ছি।"

এবার জবাব দিল কমল, "ভারবোঝা হবেন কেন মাসীমা, আপনি না থাকলে এই সংসারের কি উপায় হত? কে অরুণদা, কিরণদাকে মানুষ করত?"

"আর মা, সংসারে কি কারও জন্য কারো আটকে থাকে? তোমার মা যে মারা গেলেন তোমাদের ছোট রেখে, তোমরা কি মানুষ হও নি?"

"মানুষ আর হলাম কোথায় মাসীমা, দেখলেন ত মলিকে ধরে রাখতে পারলাম না, আমাকে বাবা বাড়ী রাখতে সাহস

পেলেন না। আমাদের বাবার মত এমন লোক কয়জন হয়, তবুও মায়ের অভাব কি আর পূরণ হয়েছে ?"

"তা সত্যি মা, বাঁচামরায় ত মানুষের হাত নেই, তবুও মনে হয়, মলি যদি তোমার মায়ের কাছে থাকত, তবে হয়ত এভাবে অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিত না।"

"সময় সময় আমার কি মনে হয় জানেন মাসীমা ? সংসারে বোধহয় বাপের চেয়েও মায়ের প্রয়োজন বেশী।"

"দূর পাগলী, বাপ না থাকলে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করত কে ? দেখ দেখি, আমার কি বিপদই না গিয়েছে মাথার উপর দিয়ে।"

"সেজন্যই ত বলছি, আপনি সহায়সম্বলহীন হয়েও যেভাবে ছেলেদের পিছনে সমস্ত শক্তি আর উৎসাহ ঢেলে দিয়েছেন, বাপে কি তা পারে ? আমাদের সঙ্গে কলেজে সুরমা বলে একটি মেয়ে পড়ত। পাঁচটি ছেলেমেয়ে রেখে তার মা মারা যাবার পর তার বাবা আবার বিয়ে করে আনেন আঠার বছরের একটি গরীব মেয়েকে। সে বেচারা নিজেই তখনও ছেলেমানুষ অথচ তার স্বামী ঐ পাঁচটি ছেলেমেয়ের ভার নিজে বইতে না পেরে চাপিয়ে দিলেন তার ঘাড়ে।"

"তা ত মন্দ নয় কমল, পুরুষমানুষ কি পারে সংসারের বোঝা বইতে। ওরা যে বাইরে উপার্জন করে, ঘর দেখবে কি করে ?"

"তা না হয় করল, তবে সৎমার উপর এত অবিশ্বাস কেন ? সে ত বিয়ের আগেই কিছু সৎমা ছিল না, তাকে

শ্বশুর বাড়ীর লোক, পাড়ার পাঁচজনে এমন কি স্বামী পর্যন্ত বিশ্বাস করেন না, কারণ সৎ মা স্বামীর ছেলেমেয়েদের যত্ন করতে পারে বা তাদের ভালবাসতে পারে এ কথা কেউ কোনদিন শোনেনি। আমার ভারী দুঃখ হয় সুরমার মায়ের জন্য আবার সুরমার কথা শুনে মনে হয় লোকের কথা ক্রমাগত শুনতে শুনতে সুরমাদের উপর তার ব্যবহারও বদলে যাচ্ছে। না হলে প্রথম প্রথম নাকি তাদের বেশ যত্ন করতেন।"

"আহা রে—বাচ্চাগুলোর কষ্ট ত খুব তাহলে!"

"তা ত হবেই মাসীমা। কিন্তু এরজন্য দায়ী কে বলতে পারেন? ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েগুলো এরকম ব্যবহার পেলে কি করে সুস্থ মনোবৃত্তি নিয়ে বেড়ে উঠবে?"

"দোষ কিছুটা তাদের সৎমায়ের, আর কিছুটা তার বাবারও বটে। তিনি যদি স্ত্রীকে বিশ্বাস করে বলতেন, ছেলেমেয়েগুলোকে একটু যত্ন কোরো, তাহলে সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করত। কিন্তু তোমার মনে এসব কথা ওঠে কেন কমল? তোমাদের ত কোন অভিযোগ থাকার কথা নয় সংসারের বিরুদ্ধে।"

"না তা নেই, কিন্তু সুরমাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না, সে বেচারা স্কুলে কলেজে হাফ ফ্রিতে পড়েছে—আমরা সবাই তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছি, চেষ্টা করেছি যাতে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে কিন্তু সবসময়ই দেখেছি কেমন একটা সঙ্কুচিত ভাব, বিব্রত আচরণ, সবসময়ই ভয়,

এই বুঝি অপরাধ করে ফেলল, হতাশা আর দীর্ঘশ্বাসে ভরা তার মন। ছোট ভাইবোন্‌গুলোকে বড় করার ভার আজ তার উপর, অথচ তার নিজেরই নেই নিজের উপর আস্থা সে কি করে ভাইবোনদের মানুষ করবে ?"

"আচ্ছা কমল তুমি এই বয়সে এত কথা ভাব কেন ?"

"কেন ভাবি তাত জানি না মাসীমা, শুধু বন্ধুবান্ধবের দুঃখের কথা শুনলে মনে হয় কেন এরকম হবে ? কে এসব নিয়ম করেছে ?"

ইন্দুমতী কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন তারপর বললেন, "কমল তোমার মনের পরিচয় পেয়ে ভারী ভাল লাগল আমার, তবে মনে হয়, এমনি করে যদি জড়িয়ে পড় অনেক বাধাবিঘ্ন আসবে সামনে, পারবে কি তা কাটিয়ে উঠতে ?"

মাথা নীচু করে বসেছিল কমল, গাঢ়স্বরে জবাব দিল, "চেষ্টা ত করব মাসীমা।"

রেখা এসে দাঁড়াল পাশে, "মা, কম্‌লিকে আমি নিয়ে যাই, ওর কলেজের গল্প শুনব।"

"যাও মা যাও। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে আমার কাছে। ওকে একটু জলটল খেতে দিও বৌমা, সন্ধ্যাও ত হয়ে এল। আমিও এবার উঠি আর চোখে দেখতে পাচ্ছি না।"

রেখার ঘরে নিয়ে এল কমলকে। দুরুদুরু বক্ষে প্রবেশ করল সে সেখানে, অরুণ হয়তো তার জন্য অপেক্ষা করে আছে,

কঠিন বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখী হতে হবে তাকে এবার। নীরবে রেখার মুখের দিকে তাকাতেই হাসল সে। না কেউ নেই এখানে। স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল কমলের। জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার বৌদি। এমন গ্রেপ্তার করলে কেন?"

"গ্রেপ্তার না করলে আসামী যে উধাও হয়ে যাবে। শেষকালে জরিমানা দেবে কে?"

"বটে! তা জরিমানাটা কি রকম ঠিক হয়েছে শুনি?"

"তিনদিনের ফাঁসী আর সাতদিনের জেল"—কলকণ্ঠে হেসে উঠল দুজনেই।

"তারপর কমল, কবে জেলখানায় প্রবেশ করছ শুনি? জেলর সাহেব যে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। আসামীর এবার আত্মসমর্পণ না করলে চলছে না।"

"দোহাই বৌদি, তুমি আবার জেরা শুরু কোরো না, জেলর সাহেবের সঙ্গেই সওয়াল জবাব করব।"

"বেশ তাই করিস্ বাপু, আমাদেরও ত ধৈর্যের সীমা আছে একটা।"

কোথা থেকে উদয় হল এসে চাঁপা, কপালে সিঁদুরের টিপ, কোলে বছর দুয়েকের সুস্থসবল শিশু, আনন্দে ডগমগ করছে সে। বিস্মিত, মুগ্ধ হয়ে গেল কমল, "কি সুন্দর মেয়ে রে তোর চাঁপা! তোকেও ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, কবে এলি?"

"এসেছি এই পরশুদিন। আমাদের সুন্দর দেখিস বুঝি

তুই আজকাল! তা ভালই রে কম্‌লি, লক্ষণটা ভালই বলতে হবে। তুইও যাতে আমার মত সুন্দর হয়ে উঠতে পারিস তার ব্যবস্থা এবার করতে হবে।”

ইঙ্গিতটা বুঝেও না বোঝার ভান করে কমল, কৃত্রিম কোপে বলে, “সেকিরে, তুই-ই না বল্‌তি আমি তোর চেয়ে সুন্দর আর আজ বুঝি আমি পাস করেছি বলেই অমনি দেখতে খারাপ হয়ে গেলাম।”

কৃত্রিম সমবেদনার সুরে বলে চাঁপা, “আহা রে মেয়ে আমার, প্রশংসাবাণী শোনার জন্য একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছেন। তা যত-ই বলিস্ বাপু, আমি অমন অপাত্রে প্রশংসার ঝুলি খালি করতে পারব না। তুই যে ডিগ্রী পাবি সে ত আমরা জানিই নূতন করে কি আর বলব।”

“ডিগ্রী পাওয়া এমন কিছু কঠিন নয় রে চাঁপা, নির্বিরোধী মন নিয়ে পড়া চালিয়ে যেতে পারলে তুইও পারবি।”

“তা আর না, আমার মাথার ডিগ্রীগুলো ছাড়া পাবার জন্য হাঁসফাস করে মরছে, নেহাৎ ছাড়ছি না তাই—”

খিলখিল করে হেসে উঠল রেখা চাঁপার বলার ভঙ্গীতে। অপ্রস্তুত হবার মেয়ে নয় চাঁপা, “দেখ দেখি বৌদি কম্‌লির রকমটা একবার, আমি এলাম ওকে নিতে আর আমাকে ও ডিগ্রী পাইয়ে দিচ্ছে। নে চল্ দেখি—”

“কোথায় রে! আমাকে ত বাড়ী ফিরতে হবে, রাত হয়ে গেলে সবাই আবার ভাববে!”

“মিথ্যেই এত লেখাপড়া শিখ্‌লি, এতগুলো বছর

বোর্ডিংএ নষ্ট করলি কম্‌লি, না শিখলি ট্যাং ট্যাং করে বিনা-কারণে ঘুরে বেড়াতে, না পারলি সাজগোজ করে বাবুগিরির পরাকাষ্ঠা দেখাতে। লেখাপড়া জানা মেয়ে তুই, তোর জন্যে আবার ভাব্‌বে কিরে ?”

“লেখাপড়া জানা মেয়ের উপর তোর ত ভারী ভাল ধারণা চাঁপা !”

“কেন হবে না বল্‌। নে যে জন্য যাবি শোন,” কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বলল, “অরুণদা তোর জন্য বসে আছে আমাদের বাড়ী।”

“ভেবেছিলাম ফাঁড়াটা বুঝি আজকের মত কেটে গেল, চল্‌ তাহলে।”

চাঁপার মেয়েকে কোলে তুলে নিল কমল। মাতৃত্বগর্বে উদ্ভাসিত চাঁপা অনর্গল ব'কে চলল সারাটা পথ। দুপাশে বিছুটি আর শ্যাওড়ার জঙ্গল নাম না জানা লতা জড়িয়ে রেখেছে তাদের, কোন সৌখিন গৃহের শোভাবর্ধনের জন্য কোন ফুলই নেয় না কেউ এখান থেকে তাই নির্বিবাদে একটার গায়ে আর একটা তার মাথায় আর একটা জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে এই নীরব মায়াপুরীর। বুনোফুলের মন মাতানো গন্ধে, মিলিয়ে আসা দিবসের ম্লান আলোয় দূরাগত রাত্রির প্রতীক্ষায় ম্রিয়মানা নীরব প্রকৃতি কমলকেও করে তুলেছে চিন্তামগ্ন। কমলের মনে হল বেশ হয় এমনি একটি শিশু নিয়ে সেও যদি ডুবে থাকতে পারে। একটি ক্ষুদ্র গৃহ, নির্জন গৃহকোণ, প্রিয়সান্নিধ্য, সন্তানের কণ্ঠের মা ডাক, এদের জন্য মেয়েদের

চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল তার মনে। মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃতি ঘটল তার।

সম্বিত ফিরে এল তার অরুণের কণ্ঠস্বরে—"অনেকক্ষণ ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি কমল"—আরক্ত হয়ে উঠল কমলের কানের গোড়া অবধি, যেন নীলাকাশের ওপার থেকে ভেসে এল 'কমল' ডাক। কতলোকেই ত ডাকে কমল বলে, এমনি ডাক ত শোনা যায় না আর কোথাও। এই একটি ডাকে এত মাধুর্য কোথায় লুকানো থাকে! নতনেত্রে দাঁড়িয়ে ছিল কমল, জবাব দিতে কথা আটকে গেল মুখে—প্রিয়-সান্নিধ্যে কথা তার হারিয়ে গিয়েছে। এইমাত্র যা সে ভাবছিল তাই যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে দাঁড়িয়ে আছে সামনে বরণ করে তুলে নেবার অপেক্ষায়, কি জবাব দেবে সে?

অরুণ আবার ডাকল, 'কমল'। যত না-বলা কথা—যত না-বলা ব্যথা সবই যেন মূর্ত হয়ে উঠল এ ডাকে। কিন্তু আর ত বাধা না দিলে চলে না, অরুণের দিকে ব্যথিত দুটি চোখ তুলে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল সে। একি অসীম আগ্রহভরা দৃষ্টিতে অরুণ তাকিয়ে আছে তার দিকে? জবাব দিল এবার সে, "বলুন"।

হেসে ফেলল অরুণ, "কি করে বলব, তুমি যদি এখনও এমনি করে দূরে সরিয়ে রাখ।"

সলজ্জ হাসিতে ভরে গেল কমলেরও মুখ, "কি করব, অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে।"

"আগে ত তুমি এমন ছিলে না কমল। কত দুষ্টুমি করতে ভুলে গিয়েছ এরি মধ্যে?"

মুহূর্তে কমলের চোখে ভেসে উঠল রাজপুরের মোহময় নদীতীর—শৈশব প্রাণ পেল আবার, আত্মবিস্মৃত কম্‌লি জবাব দিল, "তুমিই কি আর এরকম ছিলে?"

গভীরদৃষ্টিতে তাকাল অরুণ, "আর কতদিন অপেক্ষা করব বল? এবার ত তোমার প্রতিজ্ঞাপূরণ হয়েছে, এবার ত আর কোন বাধা নেই, কবে তুমি আসবে আমার ঘরে?"

মূক হয়ে গেল কমল। এ সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসার জবাব দেবে কি করে? যে এতদিন ধরে আকুল আগ্রহে দিন গুণেছে সে আজ জানতে চায় তার কাছে শুভলগণের আর কত দেরী। কিন্তু কমল যে এখনও তৈরী হতে পারেনি, তার লগন যে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে, সে খবর ত অরুণের কাছে পৌঁছায় নি। নীরব কমলের মুখে আলোছায়ার খেলা দেখতে দেখতে কি এক সন্দেহের দোলায় দুলে উঠল অরুণের বুক, বেদনায় নীল হয়ে গেল সে, ভুলে গেল স্থান কাল পাত্র, কম্‌লির সামনে এসে তার দুই কাঁধে হাতদুটি রেখে সজোরে ঝাঁকুনি দিল, "কি হল কমল আমার কথার জবাব দিচ্ছ না যে!"

পুরুষহস্তের প্রথম পরশে কমলের সারাদেহে বয়ে গেল তীব্র বিদ্যুৎ-শিহরণ, যুগ যুগ ধরে চিরন্তনী নারী বুঝি এই মুহূর্তটিরই কামনা করে এসেছে। স্নেহবঞ্চিত কমল মুহূর্তের জন্য অভিভূত হয়ে পড়ল। অরুণ তাকে আকর্ষণ করল তার

দিকে। প্রেমোন্মত্ত পুরুষের বক্ষোলগ্না বাঞ্ছিতা নারী! বুঝি গোধূলি আকাশও রাঙ্গা হয়ে উঠল সরমরাগে।

এবার কমল প্রচণ্ড শক্তিবলে মুক্ত করে নিল নিজেকে, "তুমি কি পাগল হলে অরুণদা!" নিজের স্বরও কাঁপছিল তার তখন।

বিস্মিত অরুণ জবাব দিল বিহ্বলকণ্ঠে, 'কি হয়েছে কমল, আমি কি অন্যায় কিছু করেছি? তুমি কি তাহলে···" নিদারুণ সন্দেহের কথাটা আর মুখে উচ্চারণ করতে পারল না সে।

ব্যথিত দৃষ্টি তুলে ধরল কম্‌লি, 'না অরুণদা, তোমার সন্দেহ অমূলক, আমি কাউকে কথা দিইনি। আমার নিজেরই প্রয়োজনে আমি তোমাকে আঘাত দিতে বাধ্য হচ্ছি। এ আমি পারবো না।"

"তুমি পারবে না কমল? তুমি আমার হবে না? তাহলে এতকাল ধরে আমি যা জেনেছি সবই ভুল! মেয়েদের কি তাহলে সত্যি বিশ্বাস করা যায় না?"

"এইখানেই আমার আপত্তি অরুণদা।" চোখদুটো ক্ষণেকের জন্য জ্বলে উঠল কমলের। "অবিশ্বাসের কাজ কিছু করেছি বলেত মনে পড়ছে না তবে মেয়েদের তোমরা যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত ঠিক সেভাবে আমি জীবনযাপন করতে পারব না। তোমাদের কতগুলি ভুল ধারণার মাশুল যোগাতে গিয়ে নিজের অন্তরদেবতাকে অপমান করতে পারব না আমি।"

রূঢ় কথায় লজ্জিত হয়েছিল অরুণ, এবার বিস্মিত হল কমলের কথায়—

"কিন্তু কি হয়েছে কমল ? আমায় খুলে বল। পৃথিবীতে তোমার চেয়ে প্রিয় আমার আর কেউ নেই। তোমার সুখের জন্য আমি সব সহ্য করতে পারি। আমাকে যদি বুঝিয়ে বলতে পার কিসের জন্য তোমার এ আপত্তি, চেষ্টা করে দেখতে পারি। যুক্তি বুঝব না এমন মূর্খ আমি নই।"

"আমাদের দেশের মেয়েরা যেভাবে জীবনযাপন করে, তাতে আমি তৃপ্তি পাই না, সারাদিন শুধু রান্নাবান্না, বাসন-মাজা, ছেলেমেয়ের তদারক করা, খুঁটিনাটি নিয়ে পাঁচজনের সঙ্গে ঝগড়া করা—আর অবসর সময়ে পরের কাছে নিজের নৈপুণ্যের প্রশংসা করা—এগুলো আমার মনে হয় জীবনের অপচয়। আজ যদি আমি কোন পরিবারে বধূ হয়ে প্রবেশ করি, তারা নিশ্চয়ই আমার কাছে এগুলো চাইবেন। আর আমিই বা আর পাঁচজনের মত কাজকর্ম না করে চুপচাপ বসে থাকব কি করে ? বিশেষ করে আমি ডিগ্রী পেয়েছি, সে ডিগ্রীর মর্যাদা রাখতে গিয়ে আমাকে দেখাতে হবে লেখাপড়া জানা মেয়েরা বাসনমাজা কাজটা আরও ভালই করতে পারে – কিংবা ছেলের কাঁথায় আরও ভাল ফুল তুলতে পারে। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমার চরিত্রে এ খাপ খাবে না, সংসার করাটাকেই আমি জীবনে প্রধান পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে পারব না।"

শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল অরুণ, চড়াগলায় জবাব দিল, "কিন্তু আমি ত একদিনও তোমাকে বলিনি কমল যে আমাদের বাড়ীতে তোমাকে বাসন মাজতে হবে বা

ঘুঁটে দিতে হবে। আমরা গরীব হতে পারি কিন্তু হৃদয়হীন নই।”

শান্তস্বরে জবাব দিল কমল, “তুমি কিন্তু মিথ্যে রাগ করছ অরুণদা, আমি তোমার কথা ত বলিনি, আমি শুধু আমাদের সমাজের স্ত্রীদের কথাই বলেছি। তোমার ঘরে এসে আমি যদি সৃষ্টিছাড়া আচরণ করি তাহলে চারদিকে যে বিদ্রূপ আর প্রতিবাদের ঝড় উঠবে তাতে কি একদিন তোমার মনও বিষিয়ে উঠবে না?”

“না কমল। আমি তোমায় কথা দিতে পারি, তোমার উপর আমি বিরক্ত হব না কোনদিন! আমার আজকাল যথেষ্ট রোজগার তোমাকে সুখে রাখতেই যদি না পারব, কি করব আমি সে পয়সা দিয়ে।”

“আবারও ভুল করছ তুমি অরুণদা, তোমরা হয়ত ভাব আমরা শুধু পয়সা চাই, কিন্তু তোমাদের পয়সা যে শাড়ী গয়নার রূপ ধরে মাঝে মাঝে আমাদের অঙ্গের বোঝা হয়ে দাঁড়ায় সে কথা কি একবারও ভেবে দেখেছ? একটু ভেবে আমার আর একটা কথার জবাব দাও—আমি যদি গৃহসংসারের খুঁটিনাটি কাজও না করব, সারাটাদিন কাটাব কি করে?”

“কেন? আর পাঁচজনে যেমন করে। বিশ্রাম করে, আনন্দ করে, আমার হৃদয়রাজ্যের রাণী হয়ে।”

“বিশ্রাম আর আনন্দ এ দুটো ত আপেক্ষিক শব্দ অরুণদা। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের সুস্থসবল দেহ আর মস্তিষ্ক সারা দিনরাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শুধুই বিশ্রাম

করে যাবে? পরিশ্রমটা হল কোথায় যে বিশ্রাম প্রয়োজন? আর দুঃখ না পেলে, কষ্ট না করলে আনন্দের কি মূল্য আছে বলতে পার? কি করে জানব আমি কোন্‌টা আনন্দ আর কোন্‌টা বিশ্রাম?" উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কোমল করে আনল কমল, "আর তোমার রাণী? তা রাণীর প্রজা ত থাকবে মাত্র একটি, তার জন্য আর কতটুকু সময় ব্যয় হবে?"

দুঃসহ বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গেল অরুণ। কমল আর তার চিন্তাধারা একই খাতে বইছে না। এমনি করে দুজনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যাবে এ যে তার কল্পনারও বাইরে। আশা ছিল তার এতদিন ধরে যাকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে ভেবে আসছে, সে শিক্ষিতা, কৃষ্টিসম্পন্না হয়ে তার আনন্দই বাড়াবে। পাঁচজনে দেখে ঈর্ষ্যা করবে তাকে, 'অরুণের স্ত্রীভাগ্য বটে!' কিন্তু তারপর—? তারপর কি হবে তা'ত অরুণ ভেবে দেখেনি। সকলেরই যেমন হয় তারও তেমনি হবে এটাই সে আশা করেছিল। মনোমত স্ত্রী, জীবনযাপনের জন্য প্রচুর না হোক প্রয়োজনমত অর্থ, তারপর সন্তান, সুখী পরিবার—এরমধ্যে যে আরও কতগুলো অজানা, অলিখিত প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে তা ত তার মনে হয়নি। তার চারদিকে যারা আছে তাদের কারোরইত এরকম সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছে বলে জানা যায়নি। বড় জোর শ্বাশুরী বউএ বনে না, জায়ে জায়ে ঝগড়াঝাঁটি হবার পর আলাদা হয়ে যায়। অরুণের মা বুদ্ধিমতী, তিনি যুগধর্ম মেনে নিয়ে রেখার হাতে সংসারের ভার দিয়ে দিয়েছেন, আর শিক্ষিতা মেয়ে কমলের সঙ্গে রেখারও ত

বেশ মিল আছে। গোলমাল যদি বাধেই কোনদিন সে ত অক্ষম নয়, নাহয় দাদার সম্মতি নিয়ে আলাদাই হয়ে যাবে। চিরকাল কিছু আর সকলে একসঙ্গে থাকতে পারে না। যুদ্ধ আর অর্থনৈতিক সঙ্কটের দায়ে বিপর্যস্ত বাঙ্গালীর একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে যেতে বাধ্য। এতটুকু স্বচ্ছমন তার আছে, এর জন্য কেবলমাত্র কমলকে দায়ী করবে না সে। কিন্তু সমস্যা যে একেবারে ভিন্নখাতে বইছে তা অরুণ ভাবতেও পারে নি।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। চাঁপা একটা লণ্ঠন নিয়ে এসে ওদের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে গেল। আজই ত ওদের বোঝাপড়া হবার কথা, সে বোঝাপড়ার কি এই পরিণতি নাকি? পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সে আর দাঁড়াল না সেখানে। ওদের ব্যাপার ওরাই বোঝাপড়া করবে।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত বিলীন হয়ে গেল কালের গর্ভে, হয়তো বা কয়েকটি যুগ, কে তার হিসাব রাখে! অন্তর মথিত করে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল অরুণের, তার এতদিনের স্বপ্ন, এতদিনের আশা সবই আজ মিলিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু না, পুরুষ সে, তার ত দুর্বলতা দেখালে চলবে না—ধীরে স্পষ্টস্বরে সে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে এখন কি করতে চাও তুমি? বিশ্রাম নেওয়াটা তোমার মনঃপুত নয়, কাজ করতে তোমার ভাল লাগবে না—তাহলে তোমার বক্তব্য স্পষ্ট করে বল শুনি।"

"কে বললে কাজ করতে আমার ভাল লাগবে না, কাজই

ত আমি করতে চাই। তবে কাজের মত কাজ যে কাজে আমি তৃপ্তি পাব; শুধু তাই নয় যে কাজে আমি স্বাধীন ভাবে বাঁচতে পারব, স্বাবলম্বী হতে পারব।" তীব্র বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়েও কমল যুক্তি হারায়নি তার।

অরুণ বিস্মিতকণ্ঠে জবাব দিল, "স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাও তুমি, মানুষ মাত্রেই তাই চায়, আমিও চাই। কিন্তু সমাজে কেউই ত সে রকম স্বাধীন নয়—মা ছেলের অধীন, ছেলে বাপের অধীন, স্ত্রী স্বামীর অধীন, এ সত্য কি তুমি অস্বীকার কর? এর মধ্যে কি পরাধীনতার গ্লানি আছে?"

"না তা নেই। মা ছেলে বা পিতা পুত্রের সম্পর্কও এক সময় বিষিয়ে উঠে যদি উপযুক্ত সময়ে ছেলেরা উপার্জন করতে না পারে, যদি পিতা পুত্রের মতের মিল না হয়। আর তা হতে বাধ্য, উত্তর পুরুষ আর পূর্বপুরুষ কোনদিন একমত হয় না হতে পারে না। কারণ মাঝখানে কেটে গিয়েছে প্রায় ত্রিশটি বছর—পৃথিবী এগিয়ে গিয়েছে এই ত্রিশটি বছর ধরে। তার সঙ্গে তাল রেখে শতকরা নব্বইটি স্ত্রী-পুরুষ এগোতে পারেন না। তাই আমরা সবসময় শুনে আসছি 'কালে কালে কি হল'—'আমাদের কালে এমনটি ছিল না।' স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে হয়তো এতটা হয় না, কারণ উভয়ে প্রায় একই যুগের মানুষ। তবে স্ত্রীকে স্বামীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়, একমাত্র ভাতকাপড় ছাড়া সব ব্যাপারে স্বামীর মতই তার মত, তার অনুমতির উপরই স্ত্রীর জীবনমরণ নির্ভর।"

"তুমি কি মনে কর স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব এতে ক্ষুণ্ণ হয় ? আমরা কি কাজেকর্মে আমাদের অভিভাবকদের অনুমতি নিই না ?"

"তা নাও, তবে স্ত্রীর অনুমতি অবশ্যই নাও না, কারণ স্ত্রীর তোমরা অভিভাবক। স্ত্রীকে যদি স্বামীর উপর নির্ভর করতে হয় স্বামীরও তেমনি স্ত্রীর উপর নির্ভর করা উচিত কারণ সংসারটা শুধু স্ত্রীরও নয়, শুধু স্বামীরও নয় উভয়ের দুজন সমমর্যাদাসম্পন্ন সুস্থ মানুষ, একজন করবে পোষণ, আর একজন হবে পুষ্ট, এ আমি ভাবতেও পারি না, আমিও চাই সমানভাবে বাঁচতে, আমিও উপার্জন করব অর্থ, সমাজে আমিও নেব আমার স্থান।"

"কিন্তু কমল, আমাদের সমাজে মেয়েদের ত স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়ে থাকে, স্বামীর অর্থে-সামর্থ্যে ত স্ত্রীরও সমান অধিকার।"

"সেত শুধু তোমাদের কৃপা, কৃপা নিয়ে বাঁচব কেন ? আর স্বামীর অর্থে স্ত্রীর অধিকারত শুধু স্বামীর জীবিতাবস্থায়, তাও কাগজে কলমে। স্বামীর বাপ মা, ভাই বোন, সকলকে ভরণ-পোষণ করে যদি উদ্বৃত্ত থাকে তবে না আসে স্ত্রীর দাবীর কথা রাগ কোরোনা অরুণদা, তোমাদের নিজেদের জীবনেই কি তার প্রমাণ পাওনি ? মেশোমশাই এর সঞ্চিত অর্থ আর পৈতৃক সম্পত্তির অংশ তোমার কাকা জ্যেঠারা ভাগ করে নিতেন কি করে যদি মাসীমার দাবীই থাকবে পুরোপুরি ? মাসীমাও যদি উপার্জন করতেন তাহলে কি তোমাদের এত কষ্ট করতে হত ?"

চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা যেন আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে অরুণের, কমলের কথার খানিকটা অংশ পরিষ্কার হয়ে আসছে তার কাছে। তাকে যেন ভাববার অবকাশ দিয়েই একটু থামল কমল। তারপর ধীরে ধীরে দৃঢ়, স্পষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করল, "আমি স্বাবলম্বী হব অরুণদা, নিজে উপার্জন করব, তা দেখেও যদি কোন পুরুষ কোনদিন আমাকে গ্রহণ করতে রাজী থাকে, আমার কাজ করবার অধিকার হরণ না করে, একমাত্র তাহলেই আমার প্রচলিত অর্থে সংসারে প্রবেশ করা সম্ভব হবে, নাহলে ও পাট আর হয়ে উঠল না। তোমাকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, তোমার আদর্শও আমার অজানা নয়, ততদূর ত্যাগ করতে তোমাকে বলতে পারি না, তাই তোমার ঘরে যাওয়া হয়ে উঠল না আমার। দুর্ভাগ্য বই কি।" শেষের দিকে গলা ধরে এল কমলের, চোখও হয়ে এল ঝাপ্‌সা। বড় নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে বঞ্চিত করতে হল তার।

বিচলিত হয়ে পড়ল অরুণও। উঠে এল সে কমলের সামনে, "আর যদি আমিই হই সে পুরুষ কমল। তাহলে ত আর কোন বাধা নেই?"

"না তা নেই, থাকবেও না। কিন্তু অরুণদা কলেজে থাকতে রুশবিপ্লবের কথা পড়েছিলাম, সে বিপ্লবের স্রষ্টা কার্ল মার্কস বলেছেন—'মানুষের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে হাজার বছরের সাধনা চাই'—যুক্তি দিয়ে কি সংস্কার কাটান যায়? আমাদের সমাজে পুরুষদের বড় একটা ত্যাগ করতে হয় না, তাই এতবড়

একটা জিনিস ত্যাগ করতে তাদের আরও দেরী হওয়ার কথা। তবু বলছি যদি কোনদিন পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত সংস্কারের বোঝা এড়িয়ে তুমি এসে দাঁড়াও আমার পাশে আমি তোমায় বরণ করে নেব অন্তর দিয়ে।"

মরিয়ার মত প্রশ্ন করল অরুণ, "ততদিনে যদি আর কেউ এসে দাঁড়ায় সেখানে ?"

"তা ত বলতে পারি না অরুণদা, একথার জবাব আজ কি করে দেব। তবে তোমাকে আমি সর্বান্তঃকরণে মুক্তি দিচ্ছি, আমার প্রতি তোমার আর কোন কর্তব্য নেই, আমার যুক্তির বোঝা নিয়ে আমি সরে দাঁড়াচ্ছি তোমার পথ থেকে। এ আমার অনেক ভাবনা অনেক চিন্তার পর গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত "

আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল অরুণ—'কমল'! রাস্তায় পা বাড়িয়েছিল কম্‌লি। ফিরে দাঁড়িয়ে তাকাল অরুণের দিকে, গাল বেয়ে তার নেমেছে অশ্রুবিন্দু—পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে দ্রুতপদে পা চালিয়ে দিল সে।

দুই

শ্রান্ত অবসন্ন কম্‌লি বাড়ী ফিরে এল তখন বেশ রাত হয়েছে। ছোট বৌ শাশ্বতী, সবে বিয়ে হয়েছে তার কম্‌লির মুখচোখের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। সে মুখে এমন একটা বিষণ্ণতার, এত ব্যথার ছাপ যে প্রশ্ন আটকে গেল তার মুখে। তাকিয়ে রইল শুধু সে, কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল কম্‌লি, জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার সতী, হাঁ করে দেখছ কি ?"

"দেখছি তোমার মুখের চেহারাখানা, কোথায় গিয়েছিলে ? এত রাত হল যে ?"

"গিয়েছিলাম ভাই শ্বশুর বাড়ী, তারা রাখলে না, তাড়িয়ে দিলে।"

শাশ্বতীর বুঝতে বাকী রইল না কম্‌লি কোন কথা বলতে চায় না এ সম্বন্ধে, তাই পীড়াপীড়ি করল না সেও ; শুধু বলল, "তুমি যে রীতিমত রহস্যময়ী হয়ে উঠলে ? যাহোক্ চল তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে নেবে, সকলে অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্য।"

"আমার খেতে ইচ্ছা করছে না ভাই বৌদি, তুমি যাও। চাঁপার শ্বশুরবাড়ী থেকে অনেক খাবার দাবার এসেছে তাই একগাদা খেয়ে এলাম।" শাশ্বতীর কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হলে বৌদি বলে ডাকত তাকে কমলি, নাহলে খেপাত

সতী বলে। সমবয়সী এই দুটি মেয়ের মধ্যে বহুনিন্দিত ননদ-ভাজ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও গড়ে উঠেছিল নিবিড় সখীত্বের বন্ধন। জবাব দিতে গিয়ে তেড়ে উঠল শাশ্বতী,—"কেন মিথ্যে লুকোচ্ছিস কম্‌লি, তোর চেহারাখানা মোটেই পিঠে পায়েস খেয়ে আসার মত দেখাচ্ছে না। তার চেয়ে আমি বরং একটু বসছি তুই স্নান করে শাড়ী জামাটা বদলে আয়।"

আর কথা বাড়াল না কমল সত্যি বলতে ক্ষিধেও পেয়েছিল তার কিন্তু এত অবসন্ন হয়ে পড়েছিল সে দেহমনে যে কোনমতে বিছানায় শুয়ে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সদ্যবিবাহিতা শাশ্বতীর দরদমাখা চোখ এড়ান বড় কঠিন। কোনমতে চারটি মুখে দিয়ে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল কম্‌লি। এতক্ষণকার রুদ্ধ কান্নার আবেগ আর সে সামলাতে পারল না, উচ্ছ্বসিত হয়ে ভেঙ্গে পড়ল শয্যার উপর সে, নির্জন গৃহের অন্ধকার যেন চেপে বসতে চাইল তার বুকে। আজ সে একেবারেই রিক্ত, সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দিয়েছে সে নিজহাতে। এবার তাকে শুধুই একলা চলতে হবে এ পৃথিবীতে।

তিন

কয়দিন কেটে গেল কেমন নিরানন্দভাবে। কম্‌লি যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে, খায়, দায়, আনন্দ যেন বিদায় নিয়েছে তার জীবন থেকে। জীবনে সবই আছে, আবার কিছুই নেই এই এক অদ্ভুত অনুভূতি, মস্তিষ্কের ভিতরে এক অদ্ভুত শূন্যতা পেয়ে বসল তাকে, তার ক্লান্ত মনের অবসন্নতায় দেহও হয়ে পড়ল দুর্বল। হঠাৎ একদিন তার খেয়াল হল কি আশ্চর্য! সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সে। জোর করে দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে ডাক দিল শাশ্বতীকে, 'শীগগীর আয় ক্যারম খেলবি।'

শাশ্বতীও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে - কম্‌লির আচরণে সব থেকে বিপদগ্রস্ত হয় সে, স্বামীর কাছে জবাবদিহী করতে হয় আবার কম্‌লির কাছেও ঘেঁষতে পারে না তার মুখচোখের চেহারা দেখে। তাই খুশীর সুরে বলল, "খেলব যদি বাজী রেখে খেলিস।"

"ভেবেছিস্ বুঝি আমার থেকে ভাল খেলবি? আচ্ছা কি বাজী রাখতে চাস্ শুনি? কিসের অভাব আছে তোর!"

"অভাব একটি নন্দাইয়ের, আর সবই আছে। অরুণকে ধরে এনে দিবি বল্!" ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল কমলের মুখ। চিরকালের রহস্যপ্রিয়তা তার উধাও হয়ে গিয়েছে, শাশ্বতীর অদ্ভুত আব্দারে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে

তার দিকে। হঠাৎ সে অদ্ভুত শূন্যতাবোধ আবার যেন চেপে বসল তার উপর, মাথাটা ঘুরে গেল, শক্ত করে চেপে ধরল সামনের দেয়ালটাকে। শাশ্বতী ভয় পেয়ে গেল তার মুখের চেহারা দেখে, "এই কম্‌লি, কি হয়েছে তোর? ভূত দেখেছিস্ নাকি?"

অদম্য ইচ্ছাশক্তিবলে নিজেকে সংযত করে নিল কমল, "কিছু হয়নি ভাই, শরীরটা ভারী খারাপ লাগছে।"

"শরীরের আর অপরাধটা কি, যা মূর্তি ধরে বেড়াচ্ছ আজ ক'দিন। নে শুয়ে পড়, ব্যাপারটা কি বলত শুনি?"

"ব্যাপার আবার কি? আমার শরীর বলে কি আর অসুখ হতে নেই নাকি?"

অর্থপূর্ণস্বরে শাশ্বতী বলে, "হুঁ, সেদিন মাসীমা এসেছিলেন যে, অরুণের মা।"

"কেন?"

"কেন আবার কি? মানুষের বাড়ী আসে না মানুষ?"

চোখ বুজে শুয়েছিল কমল বলল, "বলে যাও গৌর-চন্দ্রিকাত অনেকদূর হল।"

"বাপ্‌রে বাপ, মেয়ের যে আর তর সইছে না। মাসীমা জানতে চেয়েছেন আমরা আর কতদিন দেরী করব; তাঁর ছেলে যে এদিকে শুকিয়ে উঠল, রেখাও নাকি বড় তাড়া লাগাচ্ছে। অবশ্য ছেলের মা হিসাবে তাঁর বলার কথা নয়, তবে আমাদের কি না অনেক বিপদ আপদ গেল তাই প্রাচীন ব্যক্তি হিসাবে কথাটা তুললেন তিনি।"

নিস্পৃহস্বরে জবাব দিল কমল, "তা নবীনারা কি জবাব দিলেন শুনি ?"

একটু বিস্মিত হল শাশ্বতী। বিয়ের নামে কম্‌লির মুখে ত' কই রঙের খেলা শুরু হয়নি, কোন্ নারী বাঞ্ছিত পুরুষকে একান্ত আপনার করে পাওয়ার সম্ভাবনায় সরমরাঙা হয়ে ওঠে না, না কি ডিগ্রীপাওয়া মেয়ের রকমসকমই আলাদা ? তবু সে জবাব দিল, "নবীনারা বললেন যে আর ক'টা মাস গেলেই ত একটা বছর পূর্ণ হয়, বাবার মৃত্যুর একবছরের মধ্যে কোন শুভকাজ আমরা করতে চাই না, তবে আগামী শ্রাবণ আমরা পার হতে দেব না।"

"বটে ভারী সুখবর ত ? তা তুমি এখনও বসে আছ কিজন্য ? সন্দেশের বায়না দিলে না কেন ?"

"এবার দেব, কিন্তু তোর মতলবখানা কি কম্‌লি।" সত্যি রেগে ওঠে শাশ্বতী।

সংক্ষেপে জবাব দিল কম্‌লি, "মতলবখানা এই যে আগামী শ্রাবণে আমি কলকাতা যাব।"

"হানিমুন করতে নাকি রে ?"

"প্রায়। এম, এস, সি ক্লাসটা যদি শ্বশুরবাড়ীর মত মনোরম জায়গা হয় তাহলে নাহয় সঙ্গী খুঁজে নেওয়া যাবে।"

বিস্মিতকণ্ঠে শাশ্বতী জবাব দিল, "তুই বলিস কি কম্‌লি ? আবার তুই পড়তে যাবি, সত্যি এবছর বিয়ে করবি না ?"

পরিষ্কার কণ্ঠে ঘোষণা করে কমল, "এ বছর কেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই হয়ত বিয়ে করাটা হয়ে উঠবে

না। এম, এস, সি পাস করতে হবে, একটা বছর ত আবার নষ্ট হল।"

"কি পাগলামি করছিস কম্‌লি, অতদিন কি অরুণ তোর জন্য বসে থাকবে নাকি?"

"তাই কি আর কেউ থাকে।"

"অরুণের মত ছেলে লাখে একটা মেলে, তাকে এমনি করে হারাতে চাস তুই?"

"পেয়েছিলাম কবে বৌদি যে হারাব। তাছাড়া আমার পড়া আমি ছাড়তে পারব না।"

"এই তোর শেষ কথা?"

"তা জানি না এরও পরে শেষ কিছু আছে কিনা, তবে এটাই আমার সিদ্ধান্ত।"

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল শাশ্বতী। এই মেয়েটিকে সে সত্যি ভালবেসেছিল, তাই তার এই সৃষ্টিছাড়া মতিগতিতে ভারী দুঃখিত বোধ করল সে, কি মোক্ষলাভ হবে আরও পড়ে তা সে বুঝতে পারে না। কিন্তু কিই বা করার আছে তার। সদ্য পিতৃহারা কমলকে কে জোর করে বোঝাতে পারবে? বড় ভাইরা চলে গিয়েছেন কর্মস্থলে, ছোট দুই ভাইরা কম্‌লির কথার প্রতিবাদ করবে না, সেজ জা এসব সাতে পাঁচে নেই। একি দায়িত্ব পড়ল শাশ্বতীর মাথায়? মাতঙ্গিনী ঘরে ঢুকল দু'কাপ চা নিয়ে, দিশাহারা শাশ্বতী তাকেই উকিল ধরে বলে উঠল, "শুনছ মাতিদি, কম্‌লি নাকি শীগগির বিয়ে করবে না। আর কবে করবে বল দেখি?"

"হ্যাঁ রে কম্‌লি সত্যি নাকি? যাইতে দেও ছোটবৌদি এইরকম মেয়েরা কইয়াই থাকে, তুমিই কি কইছিলা নাকি যে বিয়া করবা। সাজাইয়া গুজাইয়া পিঁড়িতে বসাইয়া দেও, দেখবা মেয়ে কেমন সোনামুখ কইর‍্যা বাসরঘরে চইল্যা যায়।"

কিন্তু শাশ্বতী তেমন আশ্বস্ত হতে পারল না, মাতঙ্গিনীও বলল বটে কিন্তু তেমন যেন জোর নেই কথার। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসল, "হ্যাঁরে ধিঙ্গী মেয়ে দিমু নাকি চুলের মুঠি ধইরা কিছু। বিয়া করবি না ত করবি কি শুনি? মাষ্টারী করবি নাকি?" মাতঙ্গিনী ঠিক জানে বিয়ে আর মাষ্টারী এ ছুটোর মধ্যে আর কোন তৃতীয় সম্ভাবনা নেই। তবুও চমকে উঠল কমলের জবাবে—

"ঠিকই ধরেছিস মাতিদি। দেখিস্‌নি, সেদিন আমাদের স্কুলের হেডমাষ্টারমশাই এসেছিলেন আমাদের দেখতে? তিনি আমাকে বললেন—আমাদের স্কুলের অঙ্কের টীচার ছুটিতে গিয়েছেন, যদি পার কমল কয়দিন চালিয়ে দাও না। ভাবছি কি করব বসে থেকে, যাই কিছুদিন। এখনও ত মাস ছয়েক আছি এখানে, আমার নিজেরই স্কুল, কিছুটা ঋণশোধ করতে পারি কিনা দেখি।"

"তুই যে অবাক্ করলে রে কম্‌লি, তোর মা থাকলে এই-রকম কথা কইতে পারতে নাকি?" গলা ধরে আসে মাতঙ্গিনীর। কমলের মাকে বধূরূপে প্রবেশ করতে দেখেছে সে এ বাড়ীতে। তারপর ধীরে ধীরে সংসার বড় হয়ে উঠেছে—কাঞ্চনের বিয়ে হয়েছে—ছেলেরা লেখাপড়া শিখে চাক্‌রী

বাক্‌রী বিয়ে থা করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সবই মাতঙ্গিনীর স্পষ্ট মনে পড়ে, তারপর যেদিন নবদুর্গা চলে গেলেন কম্‌লি মলিকে তারই হাতে তুলে দিয়েছিলেন দেবী-প্রসাদ, সেই দেবীপ্রসাদও গেলেন, মলিকে ছিনিয়ে নিল তার মা—এই বৃদ্ধার নারীহৃদয়ের যতটুকু স্নেহ সে উজাড় করে দিয়েছিল কম্‌লির উপরে, আজ সেই কম্‌লি সাবালিকা হয়েছে তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখলেই মাতঙ্গিনীর সব কাজ, সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। সবাই চলে গেলেন একে একে—শুধু মাতঙ্গিনীই রইল দুঃখের বোঝা নিয়ে! সে দাসী হয়ে এসেছিল এ পরিবারে, দাসীত্ব কোন্‌দিন তাকে যে সংসারের গৃহিণীর মর্যাদা দিয়েছে তা সে জানে না—এ যেন নিতান্ত সহজভাবেই এসে গিয়েছিল তার হাতে। কিন্তু কোনদিন মাতঙ্গিনী আপন-সীমার বাইরে পা দেয়নি, তাই তারও মর্যাদাহানি হয়নি কোনদিন; আর তাই আজও নবদুর্গার জন্য চোখের জল ফেলে মাতঙ্গিনী, কম্‌লির সৃষ্টিছাড়া মতিগতিতে চোখে আঁচল-চাপা দেয় সে।

সংসারে মাতিদিরও যে একটা সুস্পষ্ট স্থান আছে তা ভুলতে পারে না কমলরা কেউই, তাই মাতিদির কান্নায় তারও যেন কোথায় বাজে বেদনা। এতটুকু থেকে তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, মায়ের কাছে বকুনি খেলে মাতিদির আঁচলের তলায় লুকিয়ে চোখের জল মুছেছে, সেদিন বাবার মৃত্যুর পরও এই মাতিদিই ঘরে তুলেছে তাকে চোখের জল মুছিয়ে। তাকে ব্যথা দিতে তাই কম্‌লিরও ব্যথা বাজে।

মৃদুস্বরে বলল, "মাতিদি মা বেঁচে থাকলে সুখীই হতেন, দেখিসনি মা সবসময় বলতেন আমার কম্‌লি যদি পাস করতে পারে! পাস করে কি আর আমায় শুধু শুধু বসিয়ে রাখতেন? আমার ইচ্ছামত কাজ করতেই দিতেন। নে দে দেখি দুধের বাটিটা, তোরা ত শুধু কম্‌লি কম্‌লি করিস—আমি যখন নাম করব মাষ্টারী করে তখন দেখিস মেয়েরা কেমন বলে আমাকে দেখলেই ঐযে কমলদিদি যাচ্ছে, আমাকে সামনে দিয়ে আসতে দেখলেই কেমন চুপ করে যাবে ভয়ে, সকলে কেমন সমীহ করে কথা বলবে!" তবুও কারো মুখে হাসি দেখতে না পেয়ে নূতন পথ ধরল বলল, "আজ রাত্রে একটু পায়েস করিস, কত কাল যে ভাল কিছু রাঁধিস না তোরা।"

বাস্ মাতঙ্গিনীর সঙ্গে সন্ধি হয়ে গেল। শাশ্বতী রইল চিন্তিত হয়ে, কম্‌লি বিষণ্ণ।

চার

আজ কম্‌লির জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় দিন তার সারাজীবনের কামনা আজ সফল হতে চলেছে। এর জন্য তীব্র সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে এমনকি নিজেরও সঙ্গে। গতরাত্রে ঘুমোতে পারে নি সে, আশঙ্কা আর উত্তেজনায় ভরা মন নিয়ে কেবলই এপাশ ওপাশ করেছে। কখনও চোখের সামনে ভেসে উঠেছে ছোটবেলার মধুর দিনটির কথা, যেদিন নিজেরও অজ্ঞাতে ঝোঁকের মাথায় ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিল সে, 'আমি শিক্ষিকাই হব।' নানাকারণে আজ তার মতেব পরিবর্তন হয়েছে, হয়তো শিক্ষকতা সে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করবেনা সারাজীবন ধরে, তবুও জীবনের প্রথম আকাঙ্ক্ষা পূরণের মধ্যে যে তীব্র মাদকতা আছে তাতে অভিভূত হয়ে পড়ল সে। কখনও বা তার মনে হয়েছিল কি আছে তার ভবিষ্যতের গর্ভে! অনেক দুঃখই সহ্য করা যায় জীবনে যদি পথে চলার সাথী থাকে সমব্যথী! কম্‌লির ত সাথীও নেই, আশীর্ব্বাদ করারও কেউ নেই! একেবারে নেই-ই বা ভাবছে কেন সে। মা বাবার মৃত্যুর পর তার স্কুলের মাষ্টারমশাই রয়েছেন, তিনি আশীর্বাদ করে গিয়েছেন সেদিন "তুমি জয়ী হবে মা! তুমি পথ দেখাও তোমার বাবার অবর্তমানে আমিই এসেছি তোমাকে নিতে, তোমার বাবা মা স্বর্গ থেকে নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করবেন।"

কম্পিত পদে কমল এসে ঢুকল স্কুলঘরে। এই তার চিরপরিচিত বিদ্যানিকেতন। একসঙ্গে ভীড় করে এল তার সামনে স্কুলে প্রথমদিন যাওয়া থেকে শুরু করে ছেড়ে যাবার দিন পর্যন্ত প্রতিটি ছবি। তার অতিপ্রিয় শিক্ষিকা নিরুদি তখনও সেখানে আছেন, তাঁকে দেখেই কমলের মনে শিক্ষিকা হওয়ার বাসনা জাগে। আজ তার স্বপ্ন সার্থক প্রায়! ঐ ত কল্‌মীদামে ঢাকা পুকুরটা! ঐ কল্‌মীফুলে ভরা পুকুরটার দিকে চেয়ে কতদিন তার মনে হয়েছে ছোটবেলার ছড়া—'কল্‌মীলতা কল্‌মীলতা, জল শুকালে থাক্‌বি কোথা!' মেয়েরা তার নাম দিয়েছিল কল্‌মীলতা! কি দিনই না গিয়েছে! টিফিনের ছুটিতে কালেভদ্রে তারা চুরি করে শিক্ষিকার যে চেয়ারে বসে পড়ানো নকল করার চেষ্টা করত আজ সেই চেয়ারে তার আসন কায়েম হল মর্যাদা রাখতে পারবে কি এর? পারবে কি নিরুদির মত মনপ্রাণ ঢেলে শিক্ষাদানে নিজেকে নিয়োজিত করতে? স্বপ্নালু হয়ে এল চোখদুটি তার।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গল হেডমাষ্টারমশাই এর কণ্ঠস্বরে, "এস কমল, তোমায় অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। এই যে মিসেস রায়, কমলকে নিয়ে যান মিস্ ঘোষের ক্লাসে, আর কমলেরত সবই জানা শুধু প্রথম সঙ্কোচটা কাটান আর কি!" কমলের পিঠে হাত রেখে বললেন, "যাও কমল, যেদিন তোমার মত আমার আরও দশটি ছাত্রী এসে এই বিদ্যায়তনটির ভার নেবে সেদিন শুধু পাব অবসর, সেদিনটির অপেক্ষায় আছি। যাত্রাপথ তোমার শুভ হোক্।"

প্রথম সঙ্কোচটা কেটে গেল তার কয়েকমুহূর্তেই যখন মিসেস্ রায় অর্থাৎ নিরুদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কাঁপা-গলায় নাম ডেকে চলল সে। মনে পড়ল তার সামনে যে কটি ছাত্রী প্রতীক্ষারত, তারা নিশ্চয়ই তাকে যাচাই করছে প্রথম দর্শনে, আর তার দুর্বলতা দেখে হাসছে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল সে, তাদের দিকে সোজাসুজি না তাকিয়ে ছাত্রীদের মাথার উপর দিয়ে দেয়ালে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, "জানো, আমিও তোমাদের মত এই স্কুলের ছাত্রী ছিলাম………"

ঘণ্টা পড়ার একটু আগে হেডমাষ্টারমশাই আর নিরুপমা রায় জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন কমল বোর্ডে অঙ্ক করে যাচ্ছে আর মেয়েরা সেদিকে তাকিয়ে আছে একাগ্রদৃষ্টিতে। নিঃশব্দ ক্লাসঘরটিতে শুধু বোর্ডে চক ঘষার টুকটাক শব্দ, থেমে গিয়েছে যত ফিসফাস গুঞ্জন আর চাপা হাসি। এক একবার কমল থেমে বুঝিয়ে দিচ্ছে, অসীম আগ্রহে মেয়েরা শুনছে তার কথা—তারপর টুকে নিচ্ছে খাতায় বোর্ডে লেখা ফরমূলাগুলো। নীরস অঙ্কও যে এমন সরস হয়ে উঠতে পারে তা যেন তারা আজই বুঝতে পারছে তাই কথা বলে বা কমলের বিরক্তি উৎপাদন করে ক্লাসঘরের পবিত্র নীরবতা ভাঙ্গতে চাইছে না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফিরে গেলেন হেডমাষ্টার মশাই আর মিসেস রায়।

পাঁচ

১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৭—ভারতের ইতিহাসে তিনটি স্মরণীয় বছর।

যুদ্ধ থেমে যেতে মানুষ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চাইল। ভাঙ্গা ঘর আবার জোড়া দিয়ে মাথা গোঁজার আশা করল তারা। এরি মধ্যে এসে গেল ১৯৪৬ সাল, অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করলেন পণ্ডিত নেহরু, আশার আলোটুকু নিবে যেতে চাইল ভয়াবহ অন্তর্ঘাতী দাঙ্গায়। সারা তুনিয়ার মানুষ চমকে উঠল সে খবরে তবু কিন্তু সুবিধাবাদী বিদেশীর দল এবার আর কায়দা করে উঠতে পারল না। এগিয়ে এল ১৯৪৭ সাল—এল সেই বহুপ্রতীক্ষিত মহামুক্তির লগ্ন—এল ১৫ই আগষ্ট। সারা দেশের লোক আত্মহারা হয়ে উঠল আনন্দে। এ যে কি আনন্দ, কি উন্মত্ততা, তার ব্যাখ্যা করা যায় না। শিরায় শিরায় বয়ে গেল স্বাধীনতার স্রোত, রোমে রোমে লেগে গেল শিহরণ। আমরা ভুলে গিয়েছি স্বাধীন মানে কি? সাতশো বছর ধরে শকহূণদল পাঠান মোগল, তারপর ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ আমরা যে দাসত্ব করেছি সকলের! আজ তার অবসান! অতি আনন্দে অশ্রু ঝরে পড়ল অনেকের। এমনই বোধ হয় হয়েছিল আমেরিকায়, যখন ক্রীতদাসরা মুক্তি পেয়েছিল, একমাত্র তারই সঙ্গে তুলনা চলে এর। বাড়ীতে বাড়ীতে, রাস্তায়, পার্কে, মাঠে-ময়দানে, স্কুলে-কলেজে,

দোকান-বাজারে, হাট-বন্দরে শুধু আনন্দ আর আনন্দ, উৎসব আর উৎসব, পতাকা আর পতাকা, ফুলের ছড়াছড়ি, যাকে পাও সেই ভাই, যাকে দেখছ সেই বলছে 'জয়হিন্দ'—আজ আর শক্রমিত্র নাই, আপনপর নাই, নারীপুরুষ নাই। সবাই আজ স্বাধীন! একি মুক্তি! এ কি উল্লাস! দেশময় পড়ে গেল উৎসবের সাড়া। এ উৎসব আমাদের পিতৃপুরুষরা কল্পনা করতে পারেন নি, তাঁরা ছিলেন পরাধীন; আর আমাদের উত্তরপুরুষ কল্পনা করতে পারবেন না, তাঁরা জানবেন না পরাধীনতার জ্বালা! এ কেবল আমরাই করতে পেরেছি; আমরাই সেই মহাভাগ্যবানের দল যারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি জাতির সে নবজন্ম, সে মহাজাগরণ। দুঃখ রইল শুধু দেশের প্রায় আধখানা চলে গেল আমাদের, রাতারাতি নিজের দেশটা হয়ে গেল পরের।

কম্‌লি তখন এম, এস, সি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে, সে ছিল কলকাতার ছাত্রাবাসে। আগষ্ট-এর প্রথম থেকেই তাদের ছাত্রাবাস তৈরী হচ্ছিল স্বাধীনতার উৎসব করার জন্যে। থেকে থেকে তার বুকের মধ্যে গুম্‌রে উঠছে কান্না! দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু সে ত রইল সেই পরাধীন, তার দেশ ত তার নিজের নয়! কিন্তু সহপাঠিনীর রহস্যভরা মন্তব্যে আলো দেখতে পেল সে—"তুই আর কি করে আনন্দ করবি কম্‌লি, তুই ত পাকিস্থানের অধিবাসী হয়ে গেলি।" তীব্র প্রতিবাদ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে তার, "কেন আমি পাকিস্থানবাসী হব? আমি ত জন্মেছি ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয় আমিও

হব আজ স্বাধীন, হয়তো আমার দেশ থেকে চলে আসতে হবে ভারতবর্ষে—আমার জন্মগত দাবীতেই অধিকার জন্মেছে আমার ভারতের নাগরিক হবার। তবে যদি আমি ইচ্ছা করে পাকিস্থানের নাগরিক হতে চাই সে স্বতন্ত্র কথা।”

কখনও বা মনে পড়ছে তার মা-বাবার কথা। আর কয়টা বছর তাঁরা বেঁচে থাকলে দেখে যেতে পারতেন বিদেশী বিদায় নিয়েছে ভারতের বুক থেকে—দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, বহু রক্তপাত আর সংগ্রামের আজ হয়েছে পরিসমাপ্তি। আবার ভেবেছে সে হয়তো তাঁদের মৃত্যু হয়ে ভালই হয়েছে, নিজের জন্মভূমিতে বসবাসের অধিকার হারিয়ে স্বাধীন হওয়ার বেদনা তাঁদের সইত না। সেদিন সে চিঠি লিখল শাশ্বতীকে—

সতী,

গুরুজন তুমি, কাজেই স্বাধীন দেশে তোমাকেই পাঠাচ্ছি আমার প্রথম স্বাধীন প্রণাম। আজ আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি স্বাধীন দেশের উন্মুক্ত হাওয়ায়। আমার জন্মভূমি আজ হস্তচ্যুত হয়ে গেল আমার, কিন্তু আমার পুত্রকন্যাদের স্বাধীন দেশে জন্মাবার দাবী হরণ করতে পারবে না কেউ আর। অবিভক্ত বাঙ্গলার মেয়ে হিসাবে আমি মনে করি আমারও দাবী আছে স্বাধীন বাংলার মাটিতে বাঁচবার। পশ্চিম বাংলার নরনারীর মত আমিও সমানভাবে ভোগ করেছি পরাধীনতার জ্বালা, আমার দেশের ভাইবোন বুকের রক্ত দিয়েছে ভারতের স্বাধীনতা আনয়নে, আজ এক কৃত্রিম বন্ধন মানব কেন আমরা? সবচেয়ে বড় কথা আমার দেশ আমি বিসর্জন

দিয়েছি স্বাধীনতার যজ্ঞবেদীতে—মহৎ ত্যাগ না করলে মহান্ প্রাপ্তি আসবে কি করে ? তাই আজ নিজের হৃদয় বেদনায় আপ্লুত হয়ে গেলেও সুখী না হয়ে পারছিনা, আজ আমি মুক্ত আজ আমার দেশ স্বাধীন। ইতি—

তোমার কম্‌লি,

১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৭ সাল।

সেদিন কমলের নিমন্ত্রণ হল মামার বাড়ী। বড় মামা নিজে এসে বলে গেলেন, "তুই যাস্ কিন্তু কম্‌লি, না গেলে তোর মামী ভারী দুঃখ পাবে। পরীক্ষা তোর সামনে, না হলে গিয়ে কিছুদিন থাকতেই বলতাম, তা এখন ত দেশ স্বাধীন হবার নামে দেশময় বইবে স্বাধীনতার হাওয়া, পড়াশোনা কদিন আর হবে না। ক্ষতি হবে না তোর বেশী।"

হেসেছিল কম্‌লি মনে মনে। তার এই বেচারা বড় মামাটি দু'কুল রাখতে গিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকেন সবসময় মনে মনে যা স্বীকার করেন তাও সবসময় মুখে বলতে পারেন না। নির্বিরোধী লোক তিনি। আবার হয়তো বাড়ীতে দুই বৌয়ে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছে তাই ডাক পড়েছে কম্‌লির। সে গেলে দুজনেই একটু অন্যমনস্ক থাকেন। কম্‌লির জন্য কে কতখানি স্বার্থত্যাগ করেছেন কম্‌লি যে আজ 'মানুষ' হয়ে উঠেছে তার পিছনে কার কি পরিমাণ উদারতা রয়েছে তার পরিমাপ করতে গিয়ে উভয়ের আপাতঃ ঝগড়াটা মুলতুবী থাকে। আজকাল অবশ্য একটু সমীহ করে চলেন তারা কম্‌লিকে। তবে বলেন কম্‌লির মত সুযোগ পেলে তারাও

এক একটা কেউকেটা হতে পারতেন। কম্‌লির এতে এমন কিছু কৃতিত্ব নেই অর্থাৎ মামার বাড়ী ছিল বলেই না কম্‌লি আজ বোর্ডিং-এ থেকে এম, এস, সি পড়তে পারছে, নাহলে আজ কেই বা চিনত তাকে! এসব মন্তব্যে আজকাল আর কান দেয় না কম্‌লি. গা সওয়া হয়ে গিয়েছে তার। নিতান্ত অসহ্য হলে উঠে চলে আসে বসে না আর বেশীক্ষণ।

সেদিন খেতে খেতে ছোট মামী বললেন, "হ্যাঁ কম্‌লি, এরপর কি করবি? তোর ভাইরা ত শুনছি শীগগিরই এদিকে চলে আসবে তাদের ঘাড়েই চিরকাল বসে খাবি নাকি?"

ভাতের গ্রাসটা মুখে তুলতে তুলতে ভেবে নিয়ে কম্‌লি জবাব দিল, "দাঁড়াও একটু ভেবে দেখি, আগে ত পরীক্ষাটা দিয়ে নেই মাষ্টারী ত আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।"

বড় মামী যেন তৈরী হয়েই ছিলেন, "তা পরীক্ষা দিতে দিতেই ত আর তোর মাষ্টারী জুটে যাচ্ছে না, ততদিন এখানে এসে থাক, ছোট ছোট ভাইবোনদের একটু দেখিয়ে দিবি পড়াশোনা।"

কোনরকমে জবাব দিল কমল, "পরীক্ষা হয়ে গেলে আসব মামীমা, আজ যাই।"

"বাপরে বাপ্ মেয়ে যেন ঘোড়ায় চড়ে আসে। এইখানেই ত মানুষ হলি, তা দু'দণ্ড বসতে তোর কি হয়? আমরা বুঝি তোর কথা বলার যুগ্যি নই!"

ততক্ষণে কম্‌লি রাস্তায়। খুব বেঁচে গিয়েছে সে, দমবন্ধ হয়ে আসছিল তার।

ছয়

হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ আর সম্ভাবনা দেখা দিল কমলের সামনে। তার রুমমেট মাধবী অর্থশাস্ত্রে এম, এ পড়ছে। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে, পড়ার সুবিধার জন্য হোষ্টেলে এসে রয়েছে, ভারী মিষ্টি স্বভাব তার, কম্‌লির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তার ব্যবহারে। সেদিন সে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছে, শনিবারের বিকেল, বোর্ডিং-এ শোনা যাচ্ছে কলেজ প্রত্যাগতা বিদ্যার্থিনীদের সহাস্য কলরব। কম্‌লি সবে হাতমুখ ধুয়ে স্টোভ জ্বেলে প্রাক্‌-বৈকালিক চায়ের ব্যবস্থা করছে, মাধবী হাঁক দিল, "এই কম্‌লি একটা ভারী সুখবর আছে, শীগগির এক কাপ চা দে আমাকে, তারপর বলছি।"

কমলও যথাসম্ভব উচ্চকণ্ঠেই জবাব দিল, "তোর সুখবর ত! ও আমার ঢের শোনা আছে। হবু ব্যারিষ্টার-এর হবু স্ত্রী, কালকের পার্টির গল্প বলবি। ওতে আমার রুচি নেই, অতএব চা-ও পাচ্ছিস না। ইচ্ছে থাকে এখানে নেমে আয়, আর এক কাপ তাহলে ঢেলে দিতে পারি।"

ফোঁস করে একটা কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে জবাব দিল মাধবী, "তোদের কেমিষ্ট্রী ক্লাসে আজকাল তাহলে মনস্তত্ত্বও শেখাচ্ছে বল্‌! তোর কপাল! না হলে কোথায় এতক্ষণ লণ্ডন প্যারিসের বিমানবন্দরে বসে রঙীন পানীয় টানবি তা না মরছিস্‌ এই পোষ্টগ্র্যাজুয়েট হষ্টেলে স্টোভ পাম্প করে!"

ততক্ষণে কমলের কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে—আশেপাশের ঘর থেকেও দুয়েকটি মেয়ে মাধবীর উচ্চকণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে ভীড় জমাতে শুরু করেছে, "কি ব্যাপার রে মাধবী! নতুন কোন শিকার পেলি নাকি?"

মাধবী গ্যাঁট হয়ে বসে পড়ল মেঝের উপর, "উঁহু, দক্ষিণা না হলে আমি আর ঠোঁট খুলছি না।" কমল চায়ের কাপটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, "ও আমি আগেই বুঝতে পেরেছি, ভাবলাম নিরিবিলি বসে রসিয়ে এক কাপ চা পান করব তা না অমনি শুনতে হবে কোন্ ব্রীফলেস্ ব্যারিষ্টারের উৎকট সাহেবিয়ানার প্রসঙ্গ।" দুষ্টুমির হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল তার ঠোটের কোণে। মাধবীকে রাগাতে এইটুকুই যথেষ্ট আর হলও তাই। ধমক দিয়ে উঠল সে।

"আরে থাম্ থাম্, মাধবী সেই শ্রীমতিই নয়, অমন অপাত্রে রস নিবেদন করে না। এই ছাখ্ তোরই ভালর জন্য বলছি, ভারত সরকার কতগুলো স্কলারশিপ দিচ্ছে বিদ্যার জাহাজ হতে বিলাত যাবার জন্য। কাজেই তুমি ইচ্ছা করলেই উড়তে পার।"

"বলিহারী বুদ্ধি তোর! তোর কি ধারণা এই স্কলারশিপ-গুলো আমার জন্য দিচ্ছে!"

"কেন নয়? একটা কেন তুই পাবি না, তোব মত ব্রিলিয়াণ্ট মেয়ে কি রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে নাকি?"

"যা বলেছিস্! সকলে ব্রিলিয়াণ্ট বলে না এই যা দুঃখ।" আশেপাশে আরও দুএকজন বলল, সত্যি কমল তোমার চেষ্টা

করা উচিত। শেষ চেষ্টা করল মাধবী, "নাঃ কোন অপদার্থ ছেলের কপালেই নাচছে দেখছি স্কলারশিপটা।"

সুরটা ধরে ফেলল কম্‌লি, "ছেলে হলেই অপদার্থ হবে কেন ? তবে যাওয়ার সুযোগ তাদেরই বেশী সেকথা অস্বীকার করছি না।"

"কেন তোরই বা কোন্ স্বামীপুত্র কাঁদছে যে তুই যেতে পারবি না ? দেশে আছে কি তোর ?" হঠাৎ চুপ করে গেল মাধবী, কম্‌লির মনের বা বাড়ীর কোন খবরই তার অজানা নয়, পাছে সে ব্যথা পায় এর বেশী আর এগোতে পারে না সে। তবে মনে হল তার কম্‌লিকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।

সেদিনের মত ব্যাপারটা এখানেই নিষ্পত্তি হলেও কমল এখানেই পার পেল না। একদিন প্র্যাকটিকাল ক্লাসের পর বাইরে বার হবার উপক্রম করতেই প্রফেসর বললেন, "তোমাকে প্রিন্সিপ্যাল ডেকে পাঠিয়েছেন, একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেও।" বিস্মিত কম্‌লি দুরুদুরুবক্ষে প্রবেশ করল অধ্যক্ষ ডাঃ বোসের ঘরে। শুকনোমুখে সে দাঁড়াতে প্রফেসর চশমাটা নাকের ডগা থেকে সরিয়ে বললেন, "এসো, তোমাকে ডেকেছি বিশেষ একটা দরকারে। তোমার ত এবার পরীক্ষা, কেমন তৈরী হয়েছে মনে হচ্ছে ?"

কেমন যেন নার্ভাস হয়ে গেল কম্‌লি,—কোনমতে বলল, "একরকম হয়েছে, তবে মাঝে মাঝে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়।"

সস্নেহে হাসলেন প্রাচীন অধ্যক্ষ, "ওরকম হয় ; পরীক্ষার হলে বসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমরা ভাল ফলই আশা করি। মাই চাইল্ড, জানি তোমার উপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা গিয়েছে, কিন্তু জানত জীবন মানেই যুদ্ধ ; ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন ?"

চুপ করে আনতচোখে দাঁড়িয়েছিল কমল, বহুদিন পর এমন সস্নেহ কণ্ঠস্বরে পিতার কথাই মনে পড়ছিল, চোখের পাতা ভিজে আসছে তার।

একটু থেমে, বোধ হয় ভেবে নিয়ে অধ্যক্ষ আবার বললেন, "যাক্, পরীক্ষার পর কি করবে ঠিক করেছ ?"

"কিছুইত এখনো ঠিক করিনি স্যার, তবে চাকরী একটা দেখে নিতে হবে।"

"বিজ্ঞানের সঙ্গে যদি তার কোন সম্পর্ক না থাকে ?"

"সে চাকরীতে আমি তৃপ্তি পাব না। হয়ত জীবনধারণের জন্য সে চাকরী নেব, তবে সুযোগ পেলেই ছেড়ে দেব।"

"লজ্জা কোরো না মা, আমি তোমার বাপের বয়সী। বিয়ে থা করার কথা ভেবেছ কিছু ?"

থতমত খেয়ে গেল কমল, পিতৃতুল্য বৃদ্ধের মুখের উপর এর কি জবাব দেবে ? কোনরকমে সে বলল, "আজ্ঞে না।"

"তাহলে আমি যদি তোমাকে একটা স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দিই, বিলেত যেতে চাও ?"

বিস্মিত হয়ে গেল কম্‌লি। প্রস্তাবটা অপ্রত্যাশিত আর আকস্মিক। হঠাৎ কি জবাব দেবে ভেবে ঠিক করতে পারল

না সে। তার কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাব দেখে অধ্যক্ষ আবার হাসলেন। বললেন, "কমল তুমি বোসো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ, লজ্জা কি মা আমি অধ্যক্ষ হতে পারি মানুষও ত বটে। শুনেছি তোমার বাবা মা নেই, দেশবিভাগের ফলে একেবারেই নিজের উপর নির্ভর, সকালে শিক্ষকতা করে দুপুরে ক্লাস কর; এসব খবরই আমার কানে এসেছে আর চোখে দেখেছি বিজ্ঞানের প্রতি তোমার অনুরাগ, পরীক্ষার খাতায় পেয়েছি তার প্রমাণ। এরপর যদি তোমাকে আরও বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ দিতে পারি সেটা ত আমারই গৌরব। তুমি যেদিন জয়ী হয়ে দেশে ফিরে আসবে, সেদিন পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকি, সে গৌরবের ভাগ আর কাউকে দেব না। স্বার্থপরের মত নিজে গ্রহণ করব। শিষ্য আর সন্তানের কাছে পরাজয়ই ত আমাদের গৌরব মা।"

সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে চোখদুটো জলে ভরে এসেছিল কমলের, ঠিক যখন সে অকূলে ভাসবার অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল তখন নিশ্চিত আশ্রয় পেয়ে বিমূঢ় হয়ে গেল সে। বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর নীরব হতে সম্বিত ফিরে পেল, নতজানু হয়ে অধ্যক্ষের পদধূলি তুলে নিল মাথায়। অস্ফুটকণ্ঠে আশীর্বাদ করলেন অধ্যক্ষ বোস মাথায় হাত দিয়ে।

সাত

কিছুদিন হল অরুণ কলকাতায় এসেছে অল্প কয়েকদিনের জন্য। ভূটানসীমান্তে ছোট একটি হাসপাতালের ভার নিয়ে চলে যাচ্ছে সে। দেশবিভাগের অনিবার্য পরিণতি তাকেও করেছে বাস্তুচ্যুত। তার জন্য খুব দুঃখ নেই। পুরুষমানুষ সে, দেশের মাটির প্রতি মায়া তার কম, দেশ তাকে দিয়েছে ত শুধু দুঃখ। শৈশবের হাসিখেলা সে অবশ্য উপভোগ করেছে তবে পিতৃহারা সেই বেদনাদায়ক দিনগুলির কথা ভুলতে পারেনি সে কোনদিন। যৌবনের সন্ধিক্ষণে যে অপূর্ব অনুভূতির স্বাদ পেয়েছিল তারও ত পরিসমাপ্তি ঘটেছে নৈরাশ্যে; দেশে আর রইল কি তার, যার জন্য ত্যাগের দুঃখ বাজবে বুকে! কিরণ একটা চাকরী জোগাড় করে নিয়েছে দমদম জেলায় মা আর স্ত্রী নিয়ে সেখানে নূতন করে সংসার পেতেছে। ইন্দুমতী কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছেন এই অবিশ্বাস্য বেদনাময় স্থান পরিবর্তনে। অপ্রবাসে অঋণে কাল কাটানোই ছিল তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, অরুণের সংসার-বৈরাগ্যে নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে কাল কাটাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ যে দুর্দ্দৈব নেমে এল তাদের জীবনে তাতে যেন সে দুঃখও ম্লান হয়ে গেল। দূর প্রবাসে অরুণের চাকরী নেবার সংবাদেও তিনি আর বিচলিত হলেন না। শুধু বললেন, “তুই যেখানে শান্তি পাবি সেখানেই যা। কেবল আমি মরবার আগে একবার দেখতে আসিস্। আর যদি বিয়ে করতে সুযোগ

পাস পছন্দ মত পাত্রীকে বিয়ে করিস। আর কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।"

জবাব দিয়েছিল অরুণ, "বিয়ে করবার জন্য আমার তাড়া নেই মা। যেখানে যাচ্ছি সেখানে ত যানবাহন বলতে কেবল-মাত্র ঘোড়া, ডাক আসে মাসে দুদিন, খাবার বলতে পাওয়া যায় রামপাখী, বিয়ে করে বৌ রাখব কোথায়, খাওয়াব কি, আর নিয়ে যাবই বা কি করে? তার চেয়ে এই বেশ আছি কোন দায়দায়িত্ব নেই, হাঙ্গামাও নেই।"

"আর আমি?" জিজ্ঞেস করেছিলেন ইন্দুমতী।

"তুমিত দাদার মা, আমার জন্যে তোমার ত ভারী মাথা-ব্যথা তোমার জন্য আমার কেন হবে?"

"তবে রে দাঁড়া, সবসময় দাদার হিংসা!" বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া সুর যেন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ম্লান হয়ে গেল ইন্দুমতীর মুখ, কোথায় গেল সে সব দিনগুলি! কে জানত সেদিন আজ তাঁরা পথে এসে দাঁড়াবেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "এত বড়টি হলি তবু স্বভাবটা বদলাল না, দেখত কি রকম হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে দাদা তোর।"

"দেখতে ত পাচ্ছি মা, সেজন্যইত আমিও চাই দাদার কষ্টের বোঝা কিছুটা লাঘব করতে। অনেক চেষ্টা ত করলাম দেশে পছন্দমত চাকরী পেলাম না, কলকাতায় ত আমার মত ডাক্তার অলিতে গলিতে; যাই বিদেশে, টাকা উপায়ও হবে, অভিজ্ঞতাও হবে। তারপর তোমারই কাছে ফিরে আসব মা।"

কোথা থেকে খবর নিয়ে এল রেখা, "মা শুনেছেন চাঁপার খবর! সেও ত কলকাতায়ই আছে, যাদবপুরের দিকে কোন কলোনীতে যেন ভাসুরদের সঙ্গে আছে। আর ......" হঠাৎ থেমে গেল রেখা।

"আর কি বৌদি," ব্যাকুল শোনাল অরুণের কণ্ঠস্বর।

মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল রেখা, "আর চাঁপা বিধবা হয়েছে।"

"কি বললে বৌমা! চাঁপা বিধবা হয়েছে, কি করে? দাঙ্গায়?"

"না মা দাঙ্গায় নয়। তার আগেই নাকি নিউমোনিয়া হয়ে মারা যায় ওর স্বামী, একটি মেয়ে নিয়ে চাঁপার আজ বড় দুরবস্থা।"

"কিন্তু চাঁপার ভাসুরদের অবস্থাত খারাপ ছিলনা বৌদি, তারা কি চাঁপাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করছেন?"

"আমাদের দেশের বিধবা মেয়েদের অবস্থাত জান অরুণ। তার উপর চাঁপার নেই বাপের বাড়ীর জোর। ওর বিয়ের কিছু-দিন পরই মারা যান ওর বাবা, মা ত আগেই গিয়েছিলেন। চাঁপার স্বামীর রোজগারও ছিল বেশ, এই ভাসুরদের পরিবার তখন সেই দেখেছে, চাঁপাই ছিল সংসারের গৃহিনী, আদরের বৌ। আর আজ চাঁপার স্বামী মারা যেতেই চাঁপা হয়েছে সংসারের গলগ্রহ। যে জায়েরা আগে চাঁপার প্রশংসায় পঞ্চ-মুখ হয়ে থাকত এখন তাদেরই বকুনি না শুনে চাঁপার দিনপাত হয় না। মেয়েটা ছয়সাত বছরের হ'ল তার লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা করতে পারল না। নিজেই যে কি করে দিন কাটাবে

তার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না, এই ত বয়স পঁচিশও হয়নি বোধ হয়, সারাটা জীবন কি ভাসুরের সংসারে দাসীবৃত্তি করেই কাটবে ?”

দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল ইন্দুমতীর মুখ দিয়ে—নিজের জীবনের কথা মনে পড়ল বুঝি ! আহারে ! কচি মেয়েটা, কি অপরাধে তার এই শাস্তি ! কি সুন্দর ঝলমল্ করত বিয়ের পর, এখন ত সারাজীবন পড়ে রইল সমাজের নির্যাতন ভোগ করার জন্য।

অনেকক্ষণ পর অরুণ বলল, “আচ্ছা বৌদি ; চাঁপা ত ক্লাস এইট নাইন পর্যন্ত পড়েছিল স্কুলে আবার ভর্তি হয়ে ম্যাট্রিকটা পাস করতে পারে না ? আজকাল ত বাস্তত্যাগী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকার থেকে নানারকম স্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা হয়েছে। তাহলে ত পরে কোন একটা অর্থকরী বিদ্যা কিছু শিখতে পাবে।”

“কি করেই বা পারবে অরুণ, কতকাল পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তার উপর আবার একটা মেয়ে আছে, তার ভার কে নেয় ? আর ভাসুরের সংসারের কাজকর্মই বা কে করবে !”

“চাঁপা ত শক্ত মেয়ে ছিল বৌদি। ওকে তুমি বুঝিয়ে বল যে করেই হোক্, প্রাইভেট পড়ে বা সকালের স্কুলে ভর্তি হয়ে হোক, ম্যাট্রিকটা পাস করে নিতে। সংসারের অশান্তি অবশ্য বাড়বে, তবে তার ভবিষ্যতটাও ত ভাবতে হবে। সত্যিই কিছু চাঁপার জায়েরা তাকে বাড়ীর বা'র করে দিতে পারবেন না। আর মেয়েটাকে কলোনীর কোন প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি

করে দিক। ভাল পড়াশোনা না হোক চর্চা ত থাকবে। তারপর চাঁপা যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তখন না হয় মেয়েকে ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।" চকিতে অরুণের চোখের সামনে ভেসে উঠল কমলের মুখ। সে বলেছিল একদিন, 'আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থা ত তুমি নিজেও জান। আমি নিজের পায়ে আগে দাঁড়াই তারপর ভাবব পরের উপর নির্ভর করার কথা'। আজ যদি চাঁপা সক্ষম থাকত, নিজে স্বাবলম্বী হতে পারত তার কি এ দুর্দিন দেখা দিত! যত দুঃখই তার হোক দুটি খেতে পরতে পাবার জন্য পরের সংসারে বিনা-মাইনের রাঁধুনীবৃত্তি করতে হত না তাকে।

স্মৃতির অতল থেকে ফিরে এলেন ইন্দুমতী, "হ্যাঁরে অরুণ, শুনলাম কমল বিলাত যাচ্ছে। তুই জানিস্ কিছু?"

চাঁপার প্রসঙ্গে কমলের কথা মনে পড়েছিল সবারই, দুজনে ত ছিল একেবারে হরিহর আত্মা! অরুণ জবাব দিল "সত্যি মা, কমল ত চিরকালই পড়াশোনায় ভাল ছিল, কলকাতায় এসেও মাষ্টারী করে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে ঠিকই। কলেজে খুব সুনামও হয়েছিল। কলেজের প্রিন্সিপ্যালই চেষ্টা-চরিত্র করে একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বছর তিনেক বিলাতে পড়াশোনা করে যখন ডক্টরেট নিয়ে কমল ফিরে আসবে তার নাগাল আর পায় কে?"

ছেলের কথায় ব্যথার সুর ইন্দুমতীর কান এড়িয়ে যেতে পারল না, বললেন, "তবু যাহোক্ আমাদের দেশের একটা মেয়ে নিজের পথ করে নিল। কষ্ট ত কম করেনি মেয়েটা।"

এরপর আর আলোচনা জমল না তেমন। শুধু রেখা একবার বলেছিল, "অরুণ এরপর কি আর তোমার মত সাধারণ ডাক্তারকে পছন্দ হবে তার?" ততক্ষণে ইন্দুমতী পাশের ঘরে চলে গিয়েছেন। অরুণ হেসে জবাব দিয়াছিল, "তাহলে আর এত কষ্ট করে লাভ হল কি বৌদি! জান না পরাধীন সমাজের মেয়ে একবার স্বাধীনতার আস্বাদ পেলে তার চরম না করে ছাড়ে না। বিদেশে ভারতীয় মেয়েদের বড় আদর। তাদের পছন্দ হলে কমলের তাদের কাউকে বরণ করতে আপত্তি কোথায়? আর ওর যা আদর্শ, তা বিদেশেই চলে, আমাদের দেশে ত চলেনা। কাজেই ওকে তোমরা খরচের খাতায় লিখে রাখ।"

তুমুল প্রতিবাদ করেছিল রেখা, "কি যে বল অরুণ, কমল আমাদের সেরকম মেয়েই নয়। দেশ ছেড়ে বিদেশকে সে ঘর বানাবে না!"

"ঐ আশা নিয়েই থাক, কমল তোমার বাড়ী এসে ভাত রাঁধবে!"

রেখার প্রতিবাদের ভাষা তেমন আর জোরালো নয় অনুভূতি দিয়ে সে বাধা দেয় অরুণের বিদ্রূপে, যুক্তি দিয়ে কিন্তু মনে হয় অরুণের কথা মিথ্যা নয়! দেশে কমলের আকর্ষণত ছিল একমাত্র অরুণ তাও ত হাবভাবে মনে হচ্ছে সেখানে ফাটল ধরেছে—তবে? তবে বেশীক্ষণ ভাববার অবকাশ মিলল না তার—লীনা এসে তাগাদা করছে, তার গান শিখতে যাবার সময় হয়ে এল, খাবার চাই তার।

আট

পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে কমলের। আশা করা যায় ফার্স্টক্লাস পাওয়া অসম্ভব হবে না। ইতিমধ্যে বিলাত যাওয়া মোটামুটি ঠিক হয়ে গিয়েছে তার, বন্ধুমহলে প্রচার হয়ে গিয়েছে সে খবর। যে স্কুলে কাজ করত কমল, সেখান থেকে পরীক্ষার জন্য কিছুদিন ছুটি নিয়েছিল, কথা ছিল পরীক্ষার ফল বা'র হওয়া পর্যন্ত সেখানেই কাজ করবে তারপর কি করা সেটা নির্ভর করবে পরীক্ষার ফলের উপরে। কানাঘুষায় খবরটা গিয়ে স্কুল-কর্তৃপক্ষের কানেও পৌঁছল, তাদের ইঙ্গিতে একদিন প্রধানা শিক্ষিকা কমলকে ডেকে বললেন, "মিস্ রায়, শুনেছি আপনি আগামী জুলাই মাসে চলে যাবেন, তবে আর কটা মাসের জন্য কেন অন্য জায়গায় যাবেন, মেয়েরাও আপনাকে ভালবাসে, এ ক'দিন আমাদের এখানেই থেকে যান।"

বিস্মিত কমল ভাবল, "ব্যাপার কি ?" স্কুলকর্তৃপক্ষ ডেকে কাউকে চাকরীতে বহাল রাখেন এ ত বড় একটা শোনা যায় না। তবে একটা কথা তার জানা ছিল না। পরিচিত, অথবা সামান্যপরিচিত কেউ যখন বহুদিনের জন্য চোখের আড়ালে চলে যায় তখন আমাদের মনের কোন্ অবচেতন কোণে জাগে বেদনাবোধ। আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর মত ভাবপ্রবণ জাতি বোধহয় বেশী নেই পৃথিবীতে। পলিমাটির দেশে মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বেড়ে ওঠে সহজেই। তাই ঝগড়ায়ও আমরা যেমন চট্ করে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দেই, ভাবেও আমরা

তেমনি গলাগলি করে অন্তরের যত রুদ্ধ দুয়ার সব খুলে দেই। কাছাকাছি থাকলে যাকে আমরা নিতান্ত হেলায় দূরে সরিয়ে রাখি, দূরে চলে গেলে তাকেই আবার একান্ত আপনার করে কাছে পেতে চাই। যে সামান্য মেয়েটি কাল আমার মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে আমার বিরক্তি উৎপাদন করেছে, আজ তার বিয়ের খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি নেমন্তন্ন করে আনি আমার এখানে দুটি ডালভাত খাবার জন্যে। যে ছেলেটি নিতান্ত সাধারণ হয়ে চোখের সামনে বড় হয়ে উঠেছিল, তাকে একদিন আবিষ্কার করি পরীক্ষায় পাস করে বড় হয়ে উঠতে। খানিকটা ঈর্ষ্যায় আমরাও তাকে পেতে চাই আপনার করে, তার গৌরবটা আমরাও চাই খানিকটা ভোগ করতে।

খবরটা বড়মামার কানেও উঠল। তিনিও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন,—"জানতাম ও মেয়ে একটা কেউকেটা না হয়ে যায় না, যা পরিষ্কার মাথা। কেন যে মেয়েটা ডাক্তার হল না। কিন্তু কি আশ্চর্য। আমাকে একবার সে নিজে জানাল না।"

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন বড়গিন্নী, "তোমাকে জানাবার জন্য তার ত ঘুম হচ্ছে না। এত যে করলে ভাগ্নীর জন্য, দেখলে ত এখন! মেয়ে এখন লায়েক হয়েছে, এখন আর আমরা কেউ নই। না খেয়ে খাইয়েছি, না প'রে পরিয়েছি তার ফলটা একবার দেখ। একেই বলে অকৃতজ্ঞ।"

চিন্তিত হয়ে উঠলেন মাতুল, "তাইত, কম্‌লির কি তাহলে অসুখবিসুখ করল নাকি। এসময় ত সাহায্যেরও দরকার হবে। কি যে করি।"

"তোমাকে কে সাহায্য করে তার ঠিক নেই, তুমি যাবে তাকে সাহায্য করতে! কমলির সাহায্য করবার মেলা লোক জুটে যাবে এখন। বলি, সাহায্য করতে যে যাবে, বিলাত যাওয়া ঠিক করার আগে ঐ মেয়ে তোমার পরামর্শ নিয়েছিল নাকি? তখন যখন মামামামীর দরকার হয়নি, এখনও হবে না।" অর্থাৎ তখন কম্‌লির এসে মামীকে বলা উচিত ছিল 'কি করি মামীমা, বৃত্তিটা পাচ্ছি তোমরা কি পরামর্শ দাও।' মামীরা বলতে পারতেন 'ম্লেচ্ছপানা ঢের করেছিস্ এবার ক্ষান্ত দে। বৃত্তি পাচ্ছিস বলেই বিলাত যেতে হবে নাকি! তোর বাবা যে কি শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছে বলিহারি! তুই মেয়েছেলে, তোর অত ধিঙ্গীপনা কেন?' অন্ততঃপক্ষে কম্‌লি যদি সেকথা না শুনে যাওয়াই ঠিক করত, বলতে পারতেন 'আমরাই দিলাম ব্যবস্থা করে, না হলে কে আর করবে, ওর কি আর তিনকূলে কেউ আছে! ছোটবেলা থেকে মানুষ করলাম, এখনও আমাদেরই ঝক্কি ত! সব কিছু করে ত পাঠালাম বিলাত এখন এসে আমাদের চিনতে পারলে হয়!' এতগুলি মুখরোচক মন্তব্যের একটাও কাজে লাগাতে না পেরে মামী রাগে ফুলছিলেন ক্রমশঃ। এমনি সময়ে কমল এসে উপস্থিত একেবারে সামনে। গম্ভীর মুখে মামী জিজ্ঞেস করলেন, "কি গো রাজকন্যে, এতকাল পরে গরীব মামামামীকে মনে পড়ল?"

মামী ভুলে গিয়েছিলেন যে কমলও আর সে কমল নেই—তাই মুখের উপর জবাব পেলেন, "তোমরাই বা কোন্ খোঁজ নিয়েছিলে মামী, এইযে এত ভুগে উঠলাম একবার না হয়

খবরই নিতে কম্‌লি মরেছে কি বেঁচেছে। মরলে না হয় তোমাদের একটা আপদ যায়ই, তাবলে একবাটি বার্লি রাঁধার ও কি ব্যবস্থা করতে পারতে না !"

নিরস্ত্র মামী তবু মরিয়া হয়েই রুখে উঠলেন, "খুব যে কথা শিখেছিস্ দেখছি, তবু ত এখনও বিলাত যাস্ নি যদি ফিরে আসিস্ তাহলে ত আর উপায় থাকবে না, চিনতে পারবি ত ?"

"পারলে এখনই চিনতে পারতাম কিনা সন্দেহ, নেহাৎ রক্তের সম্পর্ক রয়েছে ভাইবোনগুলোর সঙ্গে তাই আসি। কি গো ছোটমামী, বসতেও বলছ না যে বড়, বিলেত ত এখনও যাইনি, জাতটাও তাই এখনও আছে ঘরে উঠলে অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।"

"ভাল কথা মনে করেছিস কম্‌লি, ঘরে গঙ্গাজল নেই বলে তোকে ঘরে তুলতে পারছিলাম না, তা আর কি করা যাবে ঘুঁটের জল দিলেই শুদ্ধ হয়ে যাবে অখন।"

নয়

চাঁপার মেজভাস্থর পরমেশ চৌধুরী এককথার লোক। তিনি যখন বলেছেন চাঁপা তাদের বাড়ী থাকবে তখন তার কথামত সেখানেই তাকে থাকতে হবে। আর তা যদি পছন্দ না হয় অন্যত্র ব্যবস্থা করে নিতে পারে তিনি ওর মধ্যে নেই, তবে শমূর জন্য মাসিক পাঁচটাকা সাহায্য তিনি করবেন। বড় ভাস্থর হুমকি দিলেন চাঁপার জন্য তিনি কিছু করতে পারবেন না, তার বাড়ীর বউ হয়ে ড্যাং ড্যাং করে স্কুল কলেজে ছুটবে, এ তিনি বরদাস্ত করতে পারবেন না। হাজার হোক, পারিবারিক মানসম্ভ্রম ত একটা আছে!

মনে মনেই হাসল চাঁপা। মানসম্ভ্রমের প্রশ্ন এখনও পরমেশ তুলতে পারছেন দেখে হাসি পেল তার। তার ভাইয়ের স্ত্রী যদি তার বাড়ীতে রাঁধুনী আর ঝিএর কাজ করে দিনপাত করে, ভাইঝি তার রাস্তায় রাস্তায় কলোনীর আশে-পাশে খালিগায়ে ঘুরে বেড়ায়, রাস্তার সুবিধাশিকারী দালালরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চাঁপাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তখন কিন্তু তার পারিবারিক মানমর্যাদায় আঘাত লাগবে না। চাঁপা যদি সে সাহায্য হাত পেতে নিতে এগিয়ে আসে না হয় বড় জোর তাকে কলঙ্কিনী বলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন তাতেও মানসম্ভ্রম হানি হবে না উদ্বাস্তু পরিবারের কর্তার। তিনি সরকারী ঋণ আত্মসাৎ করে ঘর তুলেছেন, দেশে থাকতে দেশত্যাগীদের বাড়ী বিনিময়ের নামে মোটা টাকা হাত সাফাই

করেছেন, পাকিস্থানে চাঁপার স্বামীর সম্পত্তি তাঁরই সম্পত্তি বলে বিক্রী করে টাকাগুলো পোষ্টাপিসে নিজের নামে জমা করেছেন। চিরকাল এই পরের টাকায় পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খেয়ে আজ দেশবিভাগের সুযোগে যে উদ্বাস্ত সেজে কৃপার্থীর ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছেন তাতে কিন্তু সম্ভ্রম হানি হয়নি। কেবলমাত্র বিধবা ভ্রাতৃবধূ স্বাবলম্বী হয়ে নিজের মেয়েকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলেই তার আত্মসম্মানে ঘা লাগবে, এ কি ধরনের সম্মান জ্ঞান তা চাঁপার ধারনায় আসেনা। তারও আজ মনে পড়ল কমলের কথা--আমাদের সমাজে মেয়েরা শুধুমাত্রই মেয়েরে চাঁপা! রাঁধাবাড়া আর কারো স্ত্রী হয়ে ছেলেমেয়ের মা হওয়াই দেখতে আমরা অভ্যস্ত, এর বেশী চাইতে গেলেই লোকে আঁৎকে উঠে। আজকাল যে শ্বাশুড়ী ননদরা বৌকে ধরে মারে না, বা শ্বশুর ভাসুর স্বামী কথায় কথায় বৌকে ত্যাগ করে না এটাই তারা গৌরবের চরম বলে মনে করে, এটাই আগেকার দিনের চেয়ে বড় প্রগতির লক্ষণ বলে তাদের ধারণা। পৃথিবীতে আরও যে বহু দেশ আছে, তাদের মেয়েরা যে আমাদের থেকে কতবেশী উন্নত, আর অগ্রসর, তাদের পুরুষরা যে তাদের কতবেশী সুবিধা দেয় সে কথা বোঝাবার উপায় নেই, অমনি ভারতীয় নারীর সনাতন আদর্শ, হিন্দুধর্মের প্রাচীনত্ব আর মাঠাকুরমার নজীর তুলে ধরবে। যেন অন্যান্য দেশের মেয়েদের আর মাদিদিমা ছিল না, বা এমন অপূর্ব দেশও আর কোথাও নেই।"

অগত্যা চাঁপা শরণ নিল মেজজায়ের। এই মেজজা'টি

ম্যাট্রিকঅবধি পড়াশোনা করেছিল, স্বামীর সামান্য আয়, বড় জায়ের খোশামোদ করেই সে সংসারে বাস করে তারও তাই গলার জোর কম। তবে তার স্বামী বর্তমান থাকায় কিছুটা দাম আছে তাকে অনুনয় করল চাঁপা, "মেজদি সকাল বেলার রান্নাটা যদি আপনি চালিয়ে দেন, স্কুল থেকে ফিরে বাকী কাজগুলো করে দেব। শমূকে আমার সঙ্গেই স্কুলে নিয়ে যাব, ওর জন্যে আর আপনাদের ভাবতে হবে না, আর রাত্রের রান্নাটা আমি করে দেব।" সুরমা অবশ্য একভুবার বলেছিল 'যদি দিদি কিছু বলে?' "সে আমি বুঝব," জবাব দিল চাঁপা।

বহুকষ্টে বোঝায় চাঁপা দিদিকে, "আমি কি চিরকাল আপনাদেব ঘাড়ে পড়ে থাকব দিদি! শমূকেও ত তাহলে আপনাদের মানুষ করতে হবে, বিয়ে দিতে হবে। তার চেয়ে আপনি কয়েকবছর একটু কষ্ট করুন, আমি একটা ব্যবস্থা করে ওকে নিয়ে দাঁড়াই, তাহলেই ত আপনি দায়মুক্ত হলেন।"

কোনরকম করে সম্মতি আদায় করে স্কুলে ভর্তি হল চাঁপা, মেয়েকেও ভর্তি করে দিল প্রাইমারী স্কুলে। বাপের দেওয়া গয়নার তখনও দু'একগাছা অবশিষ্ট ছিল, চুড়ি বিক্রী করে বইপত্র কিনল, কঠোর পরিশ্রমে লেখাপড়া আর তার সঙ্গে সংসারের কাজ চালাতে লাগল চাঁপা। এরপর একদিন রেখার নিমন্ত্রণে দমদমে ওদের বাড়ীতে উপস্থিত হল চাঁপা আর কমল। বহুদিনের ফেলে আসা অতীত আবার প্রাণ পেয়ে জেগে উঠল দমদমের ছোট বাড়ীটিতে।

একান্তে পেয়ে চাঁপা জিজ্ঞেস করল কমলকে, "এই কম্‌লি, অরুণদা যাবার আগে তোর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছে নাকি রে ?"

"করেছে, আমার হোষ্টেলে গিয়েছিল।"

"কি ব্যাপার বলত ? এত দূরে চলে গেল কেন রে ? শুনেছি সে হতভাগা দেশে গাড়ীঘোড়া চলেনা, সপ্তাহে একবার মাত্র ডাক যায় রানার এর হাতে, খাবার পাওয়া যায় না, ওষুধপত্র ফুরিয়ে গেলে আনতে আনতে রোগীর শ্রাদ্ধ করার সময় হয়ে যায়, সে দেশে কি সুখে গেল ?"

"পুরুষমানুষ, যেখানে চাকরী পেয়েছে, সেখানেই গিয়েছে। আমরা বাস্তুহারা, স্বাধীনতার বলি, আমাদের কি আর স্থান-অস্থান বিচার করলে চলে ? তাছাড়া বাঙ্গালীরাই বিদেশ যেতে চায় না, নাহলে ইংল্যাণ্ড ইয়োরোপের ছেলেমেয়েরা ত কোন্ দূর দেশে, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করে।"

"ও ! তুইত আজকাল আবার ইংল্যাণ্ড আমেরিকার নজীর টানতে আরম্ভ করিস্ ! তোর কথাই আলাদা। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কি, তোর কোন হাত আছে নাকি এতে ?"

"নারে, আমার মতামত ত স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছি অনেক দিন আগে। মত আমাদের দুজনের এক হবার সম্ভাবনা দেখছিনা এখনও, এ অবস্থায় কি করে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি তার সঙ্গে !"

"যাবার আগে তোকে কিছু বলে গেল না ?"

"বলেছিল, 'নিজেকে তোমার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার

চেষ্টাই করব। যদি পারি সংস্কারমুক্ত হতে তোমার অপেক্ষায়ই কাটিয়ে দেব দীর্ঘদিন'।"

"কি জবাব দিলি তুই!"

"জবাব আর দিতে পারলাম কোথায়? এত দৈবদুর্বিপাকেও যার সংস্কারের মোহ কাটেনি, তার কি আর পরিবর্তন হয় রে! কিন্তু বিদায়ের মুহূর্তটায় আর আঘাত দিতে ইচ্ছা হলনা, তাই চুপ করেই রইলাম।"

"কি পাষাণ প্রাণ তোর কমলি!"

ম্লান হাসি দেখা দিল কম্‌লির ঠোঁটে। "সে কথা সত্যি তবে তোর চেয়ে নয়। এই যে এত বিপদ আপদ গেল একটা খবর দিলি না কেন? আমিই না হয় তোর ঠিকানা জানিনা, তুইত আমার হোষ্টেলের ঠিকানা জানতি?"

"সে কথা সত্যি, তবে কি জানিস্ বাঙ্গালী ঘরের বৌ আমি শুধুমাত্র মনের জোর ছাড়া আর ত কোন সম্বল ছিল না, চারদিকে হাতড়ে বেড়িয়েছি কোথায় উপায়? তোর কথা আর মনেই হয়নি। এমন সময় রেখাবৌদির সঙ্গে দেখা দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে। যোগাযোগটা বোধহয় কোন শুভমুহূর্তে ঘটেছিল তাই অরুণদার পরামর্শে স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম, আর বছরখানেক কোনমতে পার করতে পারলে হয়ত কোন একটা উপায় হবে।"

দশ

বোম্বাই বন্দরে সেদিন জাহাজ ছাড়ল কমলের, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে দূরে মিলিয়ে যাওয়া উপকূলের দিকে তাকিয়ে। চারদিক থেকে যাত্রীরা কলরব করছে, জেটি থেকে পরিচিত অপরিচিত সবাই রুমাল নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে, মহিলাদের কারো কারো চোখ হয়ে উঠেছে অশ্রুসিক্ত। কোথায় কোন্ দূর দেশে বাড়ী তাদের কারো সঙ্গে হয়তো বা পরিচয় নেই, তবু তারা সবাই ছিল ভারতের মাটিতে। দেশের মাটি, হোক্ সে হাজার মাইলের ব্যবধান তবু যেন একসূত্রে বেঁধে রেখেছিল তাদের। জাহাজ যতই কূল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে দেশও ততই সরে যাচ্ছে দূরে—স্বপ্নলোকে, অতিবড় দাম্ভিকেরও মন হয়ে উঠেছে কোমল। সকলেই অভিভূত, রুমালে চোখ মুছছে সকলেই, ভারাক্রান্ত হৃদয়ের নীরবতা প্রভাবিত করেছে সারা তরণীখানি। নীরব কমলের অন্তরে একটি কথাই শুধু ধ্বনিত হচ্ছিল—দেশের সঙ্গে শেষ যোগসূত্র-টুকুও ছিন্ন হয়ে গেল। তাকে বিদায় দিতে কেউ নেই বোম্বাই বন্দরে দাঁড়িয়ে, তাকে সবাই বিদায় দিয়ে গিয়েছেন হাওড়া ষ্টেশনে। সতী আর সমীর, চাঁপা, রেখা, মামীমারা সকলেই এসেছিলেন সেদিন, আর এসেছিলেন অধ্যক্ষ ডাঃ বোস্। ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়লে অধ্যক্ষের পায়ের কাছে নতজানু হতে প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল কমলের। সামলে নিয়েছিল সে, তার ত ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, কেউ তাকে

ক্ষমা করবে না। সংসারের কাছে সে পরাজয় স্বীকার করতে পারবে না। অধ্যক্ষ আশীর্বাদ করে বলেছিলেন "জয়যুক্ত হও মা, যাত্রাপথ তোমার শুভ হোক্।" কিন্তু আজ যেন আর অশ্রু বাধা মানতে চাইছে না, নাইবা রইল প্রিয়জন সামনে, যারা দাঁড়িয়ে আছে জেটিতে তারা সবাই যে তার আপন, নাহলে যে বোম্বাইকে সে কোনদিন চোখেও দেখে নি, তার কাছ থেকে বিদায় নিতে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কেন, না কি দুর্বলতা আত্মীয়স্বজনের কাছে প্রকাশ পাবে না বলেই তার সংযমও ভেসে যাচ্ছে আজ! সে ভুলে গেল দূর প্রবাসে মানুষ দেশের নামটা শুনলেও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, সামান্য পরিচয়কেও সাগ্রহে আঁকড়ে ধরে। অনেকদিন পরে যখন কমল বিদেশে বিদেশীর সাহচর্যে হাঁফিয়ে উঠত মাঝে মাঝে, উৎকর্ণ হয়ে থাকত একমাত্র যোগসূত্র দেশের চিঠি পাবার জন্যে, কেই বা লিখবে তাকে। কোন সভাসমিতিতে বাঙ্গালী এসেছে শুনতে পেলে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটত সেখানে একটুখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে। একটা দুটো বাংলা কথা কি তৃপ্তিই না দিত তাকে। শত অসুবিধা হলেও কোন বাঙ্গালীর বাড়ী নিমন্ত্রণ হলে রক্ষা করতে যেতে কসুর করত না। অবশ্য তার জন্য মূল্যও দিতে হয়েছে তাকে, তবে মূল্য তেমন চড়া হয়নি তাই রক্ষা। সকলেই ত তার মত ভাবপ্রবণ নয়, সকলেই দেশের প্রতি তার এ আগ্রহকে অকৃত্রিম বলে মনে করে না সন্ধান করে সে আগ্রহের পিছনে বাস্তব কিছু প্রয়োজনের।

কি আছে তার ভবিষ্যতের গর্ভে? এই যে স্বদেশ,

সমাজ, স্বজন ছেড়ে বিশাল ভারতের ভৌগোলিক সীমানা পর্যন্ত অতিক্রম করে সে আজ ভাসল অকূল সাগরে এর পরিণতি কি তাকে পৌঁছে দেবে সার্থকতার দুয়ারে না আরও পাঁচটা স্বার্থসর্বস্ব, হীনমনোবৃত্তিসম্পন্ন ভদ্রজনের মত সেও হয়ে রইবে সমাজে অপাংক্তেয় ! বিজ্ঞানসাধনা কি তার জীবনে ফোটাবে ফুল না শুধুমাত্র কণ্টকের জ্বালাই হয়ে থাকবে তার জীবনে চিরস্মরণীয় ? সহায় সম্বলহীন, আত্মীয়-পরিজনত্যক্ত কমল কি নিজেকে হারিয়ে ফেলবে জনতার ভীড়ে না নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে মাথা উঁচু করে আবার দেশে ফিরে আসতে পারবে সে ? ভাবতে ভাবতে খেই হারিয়ে গেল কম্‌লির, সম্বিত ফিরে পেয়ে সে দেখল দেশ হারিয়ে গিয়েছে দূরে দিকচক্রবালে, শুধু অস্পষ্ট কালো রেখার মত জেগে আছে দেশের স্মৃতি। আরব সাগরে তরুণ সূর্য তখন আস্তে আস্তে সোনালী কিরণ ফেলে তাদের যাত্রাপথ করে তুলেছে আলোকিত। আশীর্বাণীর মত সে কিরণধারা ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমগামী তরণীর বুকে। দেশের সন্তানকটিকে নিয়ে সে তরণীখানি তখন তরতর্‌ করে ভেসে চলেছে লবণাম্বুরাশির বুকে, গতি তার অস্তাচলের দিকে।

মাঝে মাঝে ডেকের উপর বসে তাকিয়ে থাকত সে অনন্ত জলরাশির দিকে। অনেককেই বলতে শুনত, প্রাণ হাঁফিয়ে উঠছে, আবার কবে মাটিতে পা দেব ? 'শুধু জল আর জল !' চিত্ত বিকল হবার কথাই বটে, তবু বিরাট এই অর্ণবপোতে সব ব্যবস্থাই ত রাখা হয়েছে চিত্তবিনোদনের ! কিন্তু তারও ফাঁকে

ফাঁকে মনটা হয়ে যায় বিষণ্ণ, পিছন থেকে যেন শুনতে পাওয়া যায় তালসুপারীনারিকেল ঘেরা মাটি মায়ের ডাক। সীমাহীন অতল জলধি ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়, ঝড়বৃষ্টিতে তার চেহারা হয় ম্লান। সকালে সন্ধ্যায় সূর্যের সাতরঙ্ পড়ে ক্ষণে ক্ষণে জাগায় অপূর্ব শোভা, ক্ষণপরে সে শোভা মিলিয়ে যায় মরীচিকার মত। জীবন যৌবনের অসারতা যেন স্পষ্ট উপলব্ধি হয় দূরযাত্রার উদ্দেশে জাহাজে উঠলে।

সেদিনও কমল বসেছিল ডেকে, সমুদ্রের অবস্থা বড় শান্ত, তরঙ্গহীন। গভীর নীল তার রং, আকাশের নিবিড় নীলিমাকে বুকে ধরে প্রশান্ত জলরাশি বয়ে চলেছে ধীর মন্থর গতিতে। মাঝখান দিয়ে তরতর্ করে ভেসে চলেছে 'জলকন্যা' শুধুমাত্র নিজের আয়তনের মত জলে ঢেউ তুলে। আশেপাশে উড়ে চলেছে সাদা আর বাদামী একটি দুটি দুঃসাহসী গাঙ্চিল। পরিশ্রান্ত হলে তারা বসছে জাহাজের মাস্তুলে আবার উড়ে চলেছে একটু পরেই যেন জাহাজে যাওয়াটা ওদের আত্মসম্মানে বাধে। চারিদিকে যতদূর চোখ যায় স্থলের চিহ্ন নেই কোথাও। শুধু দূরে আকাশ যেখানে ছুঁয়েছে সাগরের সীমানা সেখানে অস্পষ্ট নীলের আভাস। কোথাও যেন একটি দুটি দেশের আভাসও দেখা যায় বলে মনে হয়—ভারী ভাল লাগে কম্‌লির। কোথায় যেন দেখেছে সে এই নিঃসীম স্তব্ধ অতল জলরাশি, প্রকৃতির এই প্রশান্ত রূপ। সে কি স্বপ্নে না পূর্বজন্মে? এরই নাম কি জন্মান্তর স্মৃতি? এমনি মনের অবস্থায়ই কি কালিদাস বলেছিলেন "চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বম্

ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি"! পূর্বজন্মের স্মৃতি কি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছায়? না কি শৈশবের নদীহাওরের স্মৃতিই মনে পড়ছে আজ? অতিক্রান্ত কৈশোর অবধি যে পরিবেশে মানুষ হয়েছে কম্‌লি আজ যৌবনেও সে মধুর পরিবেশ ছায়া ফেলে মনে। জলের বুকে যে তৃপ্তি পেত সে তাই যেন হাত-ছানি দিয়ে ডাকে তাকে। মহাসমুদ্র আজ তাই তার কাছে ভয়াবহ নয়—প্রিয়। দিগন্তবিস্তৃত হাওর শৈশবে, কৈশোরে প্রথমযৌবনে যে সস্নেহ প্রীতি জাগিয়েছে মনে, তাই আজ পরিণত বয়সে ভালবাসতে শিখিয়েছে মহাসাগরকে। শৈশবে হাওরের বুকে সে মানুষ হয়েছে, বর্ষায় ফুলে ওঠা জালিয়ার হাওরের রূপে যে অভ্যস্থ, তার ত পরিণত বয়সে সাগর দেখে ভয় পাওয়ার কথা নয়? যে মাঝি 'ব্যাপারীর নাও' চালিয়েছে তার কাছে বৈজ্ঞানিকযন্ত্রপাতিসমন্বিত আধুনিক অর্ণবপোতের সারেঙগিরি করায় বাহাতুরি আছে বটে, নেই মাদকতা। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে যাত্রীর জানমান বাঁচানোর দায়িত্ব ত তার নয়। হুকুম তামিল করে গতানুগতিক জীবনযাপন করে সে মাত্র! জাহাজের তু'একজন মাঝিমাল্লার সঙ্গে তাদের অবসর সময়ে আলাপ জমিয়ে ফেলেছে কমল। তারাও আজ পরিণত হয়েছে নীরস প্রাণহীন যন্ত্রে। তবু যেন তার কেতা-তুরস্ত সহযাত্রীদের থেকে এরাই কমলের কাছে প্রিয়তর, এদেরই মধ্যে পাওয়া যায় প্রাণের পরশ। এরাই যেন তার আপনজন। নোয়াখালী, চাটগাঁ, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ আরও কত জায়গার মাঝি যে এসে জড় হয়েছে বাষ্পীয় যানের

গহ্বরের ভিতরে তার হিসেব রাখা একেবারে অসম্ভব। এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পলিমাটির দেশ বাঙ্গলার নদী হাওর সাগর, কুটির জঙ্গল, সকলের স্মৃতি। বাঙ্গলার শ্যামলিমার আভাস যেন পাওয়া যায় এদেরই চেহারায়। কে কোথায় বদলি হয়েছিল, কার কত মাইনে বাড়ল সে হিসেব না করে অবসর সময়ে দেশের গল্প বলে তারা। সে গল্প যে প্রাণ দিয়ে শুনতে চায় দরদ ঢেলে আপনার করে নেয় তাকে তারা। লুকিয়ে নিয়ে আসে ঘরে, বাক্স খুলে দেখায় সম্পত্তি, মাঝে মাঝে অনুরোধ করে 'দিদি একটা চিঠি লিখে দিবা' ? কিংবা হয়ত বলে 'কতকাল জানি দেশের খাওন খাও নাই, চারটা মাংসভাত খাইবা আমাগো ঘরে, জলের উপর ত দোষ নাই !"

এগার

স্বপ্নের মত কেটে গেল তিনটি বছর। দেশ থেকে বেরোবার সময় মনে হয়েছিল তিনটি যুগের মত দীর্ঘ হবে তারা, কিন্তু কেটে গেল তিনটি যুগ বড় তাড়াতাড়ি। এই তিনটি বছর অবিশ্রান্ত খেটেছে সে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পায়নি। প্রফেসররা হয়েছেন তার জ্ঞানস্পৃহায় মুগ্ধ, উজাড় করে দিয়েছেন তারা তাদের জ্ঞানভাণ্ডার সহপাঠিরা হয়েছে বিস্মিত কি অদ্ভুত মেয়ে এই কমল! আর কি পরিশ্রম করার ক্ষমতা, বিশ্রাম করতেও কি জানে না মেয়েটা! বিস্ময়ের সঙ্গে মিশে রয়েছে কমলের কর্মনিষ্ঠার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা। কাজ যে প্রকৃতই করে তাকে সহকর্মী অথবা সহপাঠিরা ঈর্ষ্যা করলেও শ্রদ্ধা না করে পারে না। কমল অবশ্য ছুটিও নিয়েছে, সে দিনগুলি কাটিয়েছে ইংল্যাণ্ড ইউরোপের দ্রষ্টব্যগুলো দেখে; দেখেছে প্রাণভরে ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষা ললিতকলার কেন্দ্র প্যারিস, লণ্ডন। দেখেছে সেক্সপিয়রের জন্মভূমি স্ট্রাফোর্ড অন আভন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের বিচরণভূমি লেকঅঞ্চল, ঘুরেছে মিউজিয়ম, শিল্পসংগ্রহশালা, রঙ্গমঞ্চ, নাট্যালয়। কিন্তু হাঁসের গায়ে যেমন জল লাগে না, তারও নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানসাধনাকে ব্যাহত করতে পারে নি এই ক্ষণস্থায়ী পর্যটন। লক্ষ্য তার স্থির, তাই সিদ্ধি তার করতলাগত। আজ কিছুদিন হল তাকে খবর দিয়েছেন অধ্যক্ষ বোস, বৃত্তির মর্যাদা আর অধ্যক্ষের সম্মান দুটোই বাড়িয়ে

দিয়েছে কমল, আন্তরিক অভিনন্দন পাঠিয়েছেন তিনি তাকে। তার পর জানিয়েছেন বৃত্তির নিয়মানুযায়ী ভারতে আণবিক গবেষণাগারে কাজ করতে হবে তাকে বছরদুয়েক। জাহাজে উঠবার তারিখ জানালে তিনি তার কাজে যোগদানের সময়টা ঠিক করে দেবেন। যতদিন ইচ্ছা কমল যেন ছুটি উপভোগ করে নেয়। কিছু টাকা পাঠিয়ে তিনি লিখেছেন এতদিন ত তার চারদিকে তাকাবার সুযোগ মেলেনি, যদি আরও টাকার প্রয়োজন হয় তাঁকে জানালে তিনি পাঠাবেন। কমল জানিয়ে দিয়েছে দিন পনের পরই যে জাহাজ তাতেই ফিরবে সে, ছুটি আর চাইনা তার, দেশে ফেরার জন্য মনটা বড় ব্যস্ত হয়েছে আর টাকায় তার প্রয়োজন নেই যা আছে তাতেই কুলিয়ে যাবে। অধ্যক্ষের অযাচিত স্নেহের উপর আর অত্যাচার করতে চায়নি সে। নিজের খরচ যথাসম্ভব কম করে চালিয়েছে, বৃত্তির টাকায় যাতে কুলিয়ে যায় তার জন্য যথেষ্ট সতর্ক থেকেছে, সেখানে দু'পেনী খরচ করলে চলে সেখানে আর তিনপেনী খরচ করেনি, সে কোনদিন ভুলে যায়নি সে বিদ্যার্থী, টুরিস্ট নয়। সহাধ্যায়ীরা তার এই ব্যয়সঙ্কোচকে দেখেছে শ্রদ্ধারই চোখে; দু'একজন অবশ্য পরামর্শ দিয়েছেন, বিদেশে এসেও এত কৃচ্ছ্রসাধন করতে হলে চলে কি করে? কমল জবাব দিয়েছে 'চলে ত যাচ্ছে।'

কিন্তু একজায়গায় ব্যয়কুণ্ঠ হতে পারেনি সে, চিরকালের বই-পাগলা কমল এবার সুযোগ পেয়ে পড়ে ফেলল প্রচুর

বই। ইউরোপে সামান্য চাঁদার বিনিময়ে বইয়ের দোকান অথবা লাইব্রেরী থেকে প্রচুর বই পড়ার ব্যবস্থা করা যায়। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও বই পড়ার এই সুবিধাটুকুর সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ফেলল সে। অনেক নূতন জিনিস ধরা দিল তার চোখের সামনে বিদেশে এসে। সাহিত্য আর বিজ্ঞানই শুধু নয়, অনেক জানা জিনিসও নূতন করে ভাবতে শিখল সে, সমাজতত্ত্ব আর অর্থনীতি সম্বন্ধে নূতন জ্ঞানলাভ হল তার। কত সামান্য বিদ্যা নিয়ে দেশে আমরা বড়াই করে বেড়াই, আর কত গভীর জ্ঞান নিয়েও বিদেশের ছাত্রশিক্ষকরা কত নম্র থাকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল সে। এরই আলোচনায় একদিন আলাপ হয়েছিল শারীরতত্ত্ব শিক্ষারত জার্মান ছাত্র ফ্রেডরিক কাউয়েনের সঙ্গে। এই আর এক জ্ঞানপিপাসু জাত। দিন নেই রাত নেই, পড়ছে ত পড়েই চলেছে, নোট নিচ্ছে, আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা নিপুণ ভাস্করের হাতে কুঁদে তোলা দেহ, সর্বোপরি মুখের উপর এমন এক শিশুসুলভ জিজ্ঞাসা যে তার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারে না কেউ। তবুও প্রাচ্যনারীসুলভ সঙ্কোচে কমল আগে পারেনি আলাপ করতে। লাইব্রেরীতে বইয়ের আদানপ্রদান করতে করতে দু'একদিন দেখা হয়েছে তাদের, কমলের মনে হয়েছে কে এ? তখনও সে বিদেশীর চেহারা দেখে বুঝতে শেখেনি কে কোন্ দেশের লোক। অবশেষে একদিন এগিয়ে এসেছে ফ্রেডরিক নিজেই, "মাপ করবেন আপনি ত ভারতীয়, কোন প্রদেশ থেকে আসছেন

আপনি ?" পরিচিত চেহারা, কাজেই নিঃসঙ্কোচে জবাব দিয়েছে কমল 'হ্যাঁ আমি বাঙ্গালী, আপনি ?'

"আমার দেশটা ত আপনার দেশের মত অত বিরাট নয়, আমি জার্মান !"

"নাইবা হল বিরাট, গুণের ত কম্‌তি নেই।"

"ধন্যবাদ, আপনি ত রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক।"

শ্রদ্ধায় মাথা নত করে কমল, "নিশ্চয়ই, সেই ত আমার একমাত্র পরিচয় !"

অল্প সময়ের মধ্যেই সহজ হয়ে এল দুজনেই, মামুলী প্রশ্নোত্তর আদানপ্রদানের পর ফ্রেডরিক জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা আপনি ত বাঙ্গলা দেশের মেয়ে, নিশ্চয়ই ভাল রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারেন ?"

কৌতুক ঝিলিক দিয়ে ওঠে কমলের কণ্ঠে স্বরটা নকল করে বলে সে, "আচ্ছা আপনি ত জার্মানীর ছেলে, নিশ্চয়ই ভাল কবিতা লিখতে পারেন ?"

"তার মানে ?" বিস্ময় ফ্রেডরিকের কণ্ঠে।

"বাঃ আপনি যে গ্যেটে, শিলার-এর দেশের লোক ?" যুগল কণ্ঠের উচ্চহাসিতে সচকিত হয়ে উঠে লাইব্রেরীভবন, অপ্রতিভ হয়ে যায় দুজনেই, বিদেশে এসে অভদ্র আচরণ করে ফেলল না ত ?

পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে সময় লাগে না। দুজনেই বিদেশী, দুজনেই শিক্ষার্থী, কোথায় যেন রয়েছে তাদের মনের যোগ। তারা দুজনেই চায় বিদেশকে জানতে, অতি সহজেই তাই পরস্পরের

মনের পরিচয় পেল তারা। কথা বলে দুজনেই বিদেশী ভাষায়। ইংরেজী ভাষায় আপনি তুমির তফাৎ নেই বড় একটা, সম্বোধনের কৃত্রিমতা নিয়েও তাই অসুবিধায় পড়তে হয়নি। মুগ্ধ হয়ে গেল দুজনেই, তারপর সময় পেলেই আলোচনা করেছে একসঙ্গে, পড়াশোনা করেছে একত্রে, বেড়াতেও গিয়েছে একত্রেই। সিনেমায় বা ক্লাবে, পার্টিতে বিশেষ যেত না তারা কেউ, লোকের ভীড়ে কমল সহজ হতে পারে না, ফ্রেডরিকও যেন ঠিক আনন্দ পায় না। বন্ধুবান্ধবরা তাদের ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছে পিউরিট্যান বলে, মাঝে মাঝে ইঙ্গিতও করেছে এই অসম বন্ধুত্বের সুসম পরিণতি ঘটছে না বলে! এ কিরকম ছেলেমেয়ে যাদের কোনদিনই পাওয়া যায় না ধরাছোঁয়ার মধ্যে, বন্ধুত্বের গ্রন্থি কি কোনদিন শিথিল হয় না? লাল হয়ে উঠেছে কমলের মুখচোখ লজ্জায়, ফ্রেডরিক শুধু হেসেছে। প্রশান্ত ক্ষমাসুন্দর সে হাসি। তার ব্যবহারে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে কমল। সুস্থ হলে ফ্রেডরিক তাকে বলেছে, "কেন তুমি উত্তেজিত হও মিছামিছি? এ দেশেও এমন লোকের অভাব নেই যারা মনে করে তরুণ-তরুণীর সম্পর্কটা শুধুই দেহের। ওদের কথার গুরুত্ব দিলে নিজেকেই ছোট করা হয়। হেসে উড়িয়ে দিতে পার না ওদের?"

আরক্তমুখে জবাব দিয়েছিল কমল, "জানই ত আমি ওরকম বাজে ঠাট্টা সইতে পারি না। তুমিই ত ফেল আমাকে বিপদে, মাঝে মাঝে যোগ দিলেই ত পার ওদের সঙ্গে।"

সহাস্যমুখে জবাব দেয় ফ্রেডরিক, "ওরা জানে আমি বিদেশী ওদের হাল্কা নাচে আমি আরাম পাই না। তাছাড়া যুদ্ধের দরুণ ত পড়াশোনা করতে সময় পাইনি, তাই সময়টাকে হেলায় নষ্ট করতে বড় অস্বস্তি লাগে।"

"ওরা কিন্তু বলে যুদ্ধ করেছে বলেই, জীবনের নশ্বরতা এত বেশী বুঝেছে বলেই ওরা জীবনটাকে ভোগ করে নিতে চায়।"

"সকলের জীবনদর্শন ত এক নয় কমল। জীবন ভোগ করার মানেটাও সকলের কাছে সমান নয় তাছাড়া তুমিও ত যাও না ওদের ক্লাবে, আড্ডায়। তোমার কি ইচ্ছা হয় না নেচে গেয়ে জীবনকে জেনে নিতে?"

"মাঝে মাঝে একেবারে যে না হয় তা নয়, কিন্তু জানই ত ভারতবর্ষ সংযমের দেশ, নিজেকে তাই সংযত করে নেই", ঠাট্টা করে কমল সহাস্যে, সন্ধি হতে দেরী হয় না।

এমনি করে কেটে যায় প্রবাসের দিনগুলি। মাঝে মাঝে প্রবাসকেই মনে হয় তার স্বদেশ। তার জীবনের স্বপ্ন যেন রূপ পেয়েছে এখানে। পথেঘাটে মেয়েদের দেখে সে, স্বচ্ছন্দ-জীবনযাপনকারী নারীপুরুষ যেন আকৃষ্ট করে তাকে। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে জানতে বুঝতে চেষ্টা করে, এমনি করে কেটে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলি। বিদেশে এসে নবজন্ম হয়েছে কমলের।

আর দু'একদিনের মধ্যেই পরীক্ষার সঠিক ফল জানতে পারবে কমল। দেশে ফেরার সময় হয়ে এল তার। বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় একটা বই সামনে ধরে কমল বিগত তিনটা

বছরের হিসাবনিকাশ খতিয়ে দেখছিল, সে কি দেশের বন্ধন ছিঁড়ে এসে বিদেশের বন্ধনে জড়িয়ে ফেলল নিজেকে—দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল, "ভিতরে আসতে পারি ?"

আত্মস্থ হয়ে কমল জবাব দিল, "নিশ্চয়ই।"

অসময়ে ফ্রেডরিককে দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠল কমল, "কি ব্যাপার তুমি যে হঠাৎ ?"

বড় করুণ দেখায় ফ্রেডরিকের চেহারা, "হঠাৎই বিরক্ত করলাম তোমাকে. একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি।"

"কি দুঃসংবাদ ফ্রেডরিক, আমার পরীক্ষার ফল বুঝি !" উদ্বেগের সুর কমলের কণ্ঠে।

"হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত তোমার পেপার উৎরাবে না এ আশঙ্কা ত করিনি, কি হয়েছিল বলত ?"

পৃথিবী দুলে উঠল কমলের সামনে, মুহূর্তে মুছে গেল বিশ্বসংসার চোখের সামনে থেকে, ঘরের টেবিলচেয়ার, সামনে দাঁড়ান ফ্রেডরিক সবই টলতে লাগল তার চোখের উপর। হাত বাড়িয়ে ফ্রেডরিক ধরে ফেলল তাকে ····বিলীন হয়ে গেল একটি দুটি সংজ্ঞাহীন মুহূর্ত মহাকালের গর্ভে, নিজেকে সংযত করে নিল ফ্রেডরিক অমানুষী শক্তিবলে। সে ত কাপুরুষ নয়, দুর্বলতার সুযোগ সে নিতে পারে না, এ পাওয়া তার সত্যিকার পাওয়া নয়। সশব্দে হেসে উঠল সে—জোর করে বসিয়ে দিল কমলকে সামনের চেয়ারটায়, "কি বোকা মেয়েরে বাবা, ঠাট্টা করছিলাম বুঝতে পারনি ? নিজের উপর একটুও জোর নেই দেখছি, এই নাও প্রফেসারের চিঠি, আর

এই নাও আমার অভিনন্দন।” দুখানা সুদৃশ্য খাম এগিয়ে দেয় সে।

আত্মস্থ হতে সময় লাগল কমলের, ফ্রেডরিক খানিকটা সময় দিল তাকে, তারপর বলল, “কেমন খুশী ত? নাও চল আজকের বিজয়োৎসব করে আসি অক্সফোর্ডের খালে নৌকা বেয়ে।” এবার আর কিছুতেই আপত্তি নেই কমলের, “তাহলে তুমি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, আমি তৈরী হয়ে আসি।”

মিনিট দশেক পর বেরিয়ে এল কমল দরজা খুলে, শব্দ পেয়ে ফ্রেডরিক তাকাল ফিরে, মুগ্ধ হয়ে গেল সে টুকটুকে লাল শাড়ীপরা কমলকে দেখে। এ পোশাকে সে তাকে কখনও দেখেনি, এগিয়ে যেতে যেতে থেমে গেল সে, অস্ফুট-কণ্ঠে সে বলল ‘চমৎকার!’ ততক্ষণে কমল এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, ফ্রেডরিকের চোখে প্রশংসার দৃষ্টি তার চোখ এড়ায়নি। সহজ হবার জন্য বলল, ‘চল।’ বিমুগ্ধ ফ্রেডরিকও হাসল একটু, পাশাপাশি চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করল “কি ব্যাপার কমল, বিপদ-সংকেত নাকি?” একটু থেমে জবাব দিল কমল, “না, আনন্দ-উল্লাস।”

“তাই বল, বাঁচালে আমাকে, ভয়েই মরে যাচ্ছিলাম।”

“ভারী বীরপুরুষ তুমি!”

কাছের চা-খানায় দু'কাপ কফি আর কিছু স্যাণ্ডউইচ খেয়ে নিয়ে যখন তারা খালের মুখে এসে দাঁড়ালো নৌকার আশায় ইংল্যাণ্ডের শরতের সূর্য তখন দিগন্ত ছোঁয়ার আশায়

ব্যাকুল। এই সময়টাই কেবলমাত্র রঙ্গের আভা দেখা দেয় আকাশে খালের জলও তাই বহুবর্ণে চিত্রিত। আকাশে সন্ধ্যার ম্লানিমা দেখে ঘরমুখো যে দু'একজন নৌকা ফেরৎ দিতে এনেছে তারই একটা দখল করল কমল আর ফ্রেডরিক। তখন অল্প অল্প বাতাস বইতে শুরু করেছে, শুধুমাত্র দাঁড়টা হাতে ধরে বসে রইল ফ্রেডরিক, আর কমলের হাতে বৈঠা। আস্তে ভেসে চলেছে নৌকা পাশ দিয়ে পড়েছে নীচু হয়ে ক্রন্দসী উইলোর ডাল, দূরে গীর্জার অভ্যন্তর থেকে শোনা যাচ্ছে সান্ধ্য উপাসনার গম্ভীর সুর·····

.........Thy kingdom come on earth

as it is in heaven............

.........And lead us not into temptation

শুনতে শুনতে বিজয়গর্বে উল্লসিত কমলের মন চলে গিয়েছে বহুদূরে—রাজপুরে তার ছায়াঘেরা জন্মভূমিতে। সার্থক হয়েছে তার প্রতিজ্ঞা আজ, পিতার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিও আজ পূর্ণ হয়েছে ; নিজের পথের সন্ধান করে নিতে পারবে সে নিজেই। রাজপুরের শান্ত প্রকৃতি, আনন্দঘন পরিবেশ, দেবীপ্রসাদের মৃত্যুপাণ্ডুর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি, নবদুর্গার আকাঙ্ক্ষা সবই যেন আজ মূর্ত হয়ে উঠেছে কমলের চোখের সামনে এই সাত-সমুদ্র-তের-নদীর পারের মনোরম প্রদোষবেলায়। আর অরুণ? আজও বোধহয় সে সংস্কার কাটাবার সাধনা করছে, কে জানে? অরুণের কথা মনে হতেই সচেতন হয়ে উঠে আজ কমল, মোহমুগ্ধ চোখে পাশে

বসা ফ্রেডরিকের মুখের দিকে তাকাতেই আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল তার হৃদয়, এ দৃষ্টি ত ভুল করার নয়! সলজ্জ হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করে সে ফিরিয়ে নিল দৃষ্টি। স্তব্ধ কমলের মুখের দিকে একান্তে তাকিয়ে ছিল ফ্রেডরিক, তারও হৃদয় আজ পরিপূর্ণ। বহুদিনের প্রবাস আজ সার্থক হয়েছে কমলের। এ বিজয়ে তারও হয়েছে অকৃত্রিম আনন্দ। পরমুহূর্তেই দেখা দিল তীব্র বেদনাবোধ কমল ত এবার চলে যাবে, কমলের জীবনে তার প্রয়োজন ত একেবারেই ফুরিয়ে গেল। দুজনের মাঝখানে এরপর দেখা দেবে দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধান, শুধু বারিসমুদ্রই নয়, দেশকালের ব্যবধান ত সমুদ্রেরই মত দুরধিগম্য। হঠাৎ কমলের দিকে চোখ পড়তেই মনে হল আজ ত সাগর আর অনতিক্রমনীয় নয়, আজও কি কমল আর তার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই বেড়ে যাবে? চিন্তার সূত্র হারিয়ে গেল তার কমলেরই ডাকে, "কি ভাবছ, ফ্রেডরিক অমন তন্ময় হয়ে?"

"ভাবছি তোমারই কথা।" স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করে সে।

স্বভাবসিদ্ধ রসিকতাবোধ হারায় না কমল, "আমাকে সামনে রেখে আমারই কথা ভেবে চলেছ তুমিত বড় অরসিক!"

"ঠিক তাই, নাহলে যে কথা অনেকদিন বলব ভেবেছি আজও তা বলতে পারছি না কেন?"

"কি এমন কথা যা আমাকেও বলতে পারছ না ফ্রেডরিক?"

"মনে করছি এবার ঘর বাঁধতে পারলে বেশ হয়। এত-

কাল ধরে যার সন্ধান করে বেড়িয়েছি তাকে পেয়েছি চোখের সামনে, আর ত তাকে ছেড়ে দিতে পারি না।”

তবুও ধরা দিতে চায় না কমল, “এবার তাহলে ঘর বাঁধার প্রেরণা পেয়েছ বল। ভালই হল আমি ত দেখে যেতে পারলাম না তাকে আমার হিংসা হচ্ছে ফ্রেডরিক।”

গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ফ্রেডরিক, “তোমারও তাহলে হিংসা হয় কমল! আমি ত ভেবেছিলাম তোমরা অন্য ধাতুতে তৈরী; দয়ামায়া ঈর্ষ্যাদ্বেষ তোমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না।”

সে দৃষ্টির সামনে অভিভূত হয়ে পড়ল কমল। ধীরে স্পষ্ট কণ্ঠে সে ঘোষণা করল, “সবই আমাদের আছে ফ্রেডরিক, প্রকাশের পথ পায় না শুধু।”

আত্মহারা হয়ে যায় ফ্রেডরিক কমলের এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ডাকে—“কমল”, ডানহাতটা তার চেপে ধরে সে, থরথর করে কেঁপে ওঠে কমলের হাতখানি সে আবেগে কিন্তু হাতটা সে সরিয়ে নেয় না। আবার বলে—“বিদেশী আমি, বিদেশে স্বদেশের সম্মান রাখার ভার আমার উপর, দেশে আমি নিতান্ত সাধারণ নগণ্য নাগরিক মাত্র, কিন্তু বিদেশে আমি ভারতীয়। আমার ব্যবহারের বিন্দুমাত্র অশোভনতায় ভারতের অসম্মান, তাই আমাকে হতে হয় রক্ষণশীল, না হলে আমিও মানুষ, নারীহৃদয়ের কোন ধর্মই আমাকে ত্যাগ করে যায় নি।”

“তোমাদের দেখে আমরা অবাক্ হই কমল!”

"তোমাকে দেখে আমিও কম অবাক হইনি ফ্রেডরিক, তুমিও ত ইউরোপেরই পুরুষ, অথচ কত তফাৎ তোমার আর পাঁচজনের সঙ্গে।"

"তফাৎ হয়তো বিশেষ নেই, তবে আমি চট্ করে মানুষের সঙ্গে মিশতে পারি না বলেই বোধহয় যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তাদের স্নেহে বাঁধা পড়ে যাই।" হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, "কমল, তুমি কি শীগগিরই দেশে ফিরে যাবে ?"

"তাই ত ভাবছি ফ্রেডরিক ! এখানকার কাজ ত আমার শেষ হয়ে গেল, আমার বৃত্তির সর্ত অনুসারে ভারতে আমাকে কাজে যোগ দিতে হবে যত শীঘ্র সম্ভব। অবশ্য দেরী কিছুদিন করতে পারি, কিন্তু কি লাভ তাতে ?"

"কারো যদি জীবনমরণের প্রশ্ন হয়, তাহলেও কি তুমি শুধু লাভের প্রশ্নই দেখবে কমল ?"

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল কমল ফ্রেডরিকের দিকে ! আগ্রহ-ভরা সে দৃষ্টির সামনে কমল হয়ে পড়ল নির্বাক, দৃষ্টি নত হয়ে এল কিছুক্ষণের জন্য। ম্লানিমা এসে গ্রহণ করল তার কপোলের রক্তিমাভা—পাল্টা প্রশ্ন করল কমল, "আমার লাভালাভের প্রশ্নে কি পৃথিবী থেমে থাকবে ফ্রেডরিক ?"

"তা হয়তো থাকবে না। তবু ত মানুষ প্রশ্ন না তুলে পারে না। চল পাড়ে উঠি।"

নৌকাটি জমা দিয়ে পাড়ে উঠল তারা। দুপাশে সারি দিয়ে পাইনগাছের বন, আবছা আলোকে বনপথ হয়ে উঠেছে

মায়াময়। পাশাপাশি চলতে চলতে কখন যে দুজনের হাতে হাত মিলে গিয়েছে তা তারা জানে না। পরম বিশ্বাসে, পরিপূর্ণ হৃদয়ে হল তাদের সপ্তপদী গমন, মনের যত ব্যাকুলতা, যত না বলা বাণী সবই বলা হয়ে গেল আজ। ভারানত হৃদয়ের নীরবতায় মুখর হয়ে রইল তারাভরা আকাশ। পথটা শেষ হল এসে কমলের দরজায়, প্রবেশ করল তারা ভিতরে।

নীরবে ঘড়িটা শুধু প্রহর ঘোষণা করে চলেছে, ঘরের উজ্জ্বল আলোর নীচে উভয়ের জীবনের সমস্যাগুলিও দেখাল উজ্জলতর হয়ে। পরম পাওয়ার জন্য করতে হবে চরম ত্যাগ। কমলের জীবনে যে পরম লগ্ন এল আজ তাকে সে বরণ করতে পারে কতক্ষণের জন্য? সারাজীবন ধরে শুধু পেয়ে হারাবার বেদনাই কি সহ্য করতে হবে তাকে? এই কি তার বিধিলিপি? কিন্তু বিধিলিপি ত সে মানে না—তার নিজের ভাগ্য ত সে ইচ্ছা করলেই গড়তে পারে—কে তাকে বাধা দেবে? চমক ভাঙ্গল তার ফ্রেডরিকের আর্তস্বরে, "কমল আমার কথা একবারও ভাবলে না, তোমাকে বাদ দিয়ে আমার জীবন কি করে কাটবে?"

বড় করুণ শোনাল কমলের কণ্ঠস্বর, "তোমার কথা বাদ দিয়ে শুধু নিজের কথাই ভেবেছি একথা বলছ কি করে ফ্রেডরিক। কিছুদিন ধরে শুধু তোমার কথাই যে ভেবেছি। আমার জীবন যদি কাটাতে হয় তোমাকে বাদ দিয়ে আর আমি নারী হয়ে তা সহ্য করতে পারি, তুমি পুরুষ হয়ে পারবে না সহ্য করতে?"

"কিন্তু কমল আমাদের দুজনের জীবন যে বয়ে চলেছে একই ছন্দে, একই মন্ত্রে আমরা বিশ্বাসী, এসো না দুজনে মিলে বিজ্ঞানের সাধনায় জীবন কাটিয়ে দিই একসঙ্গে। দেশে ত তোমার এমন কিছুই নেই যার জন্য তোমাকে ফিরতেই হবে। বিজ্ঞানের গবেষণা করতে করতে যদি মৌলিক কিছু আবিষ্কার কর তা হবে তোমারই দেশের সম্পদ, আমি বা আমার দেশ তা আত্মসাৎ করবে না এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারি তোমাকে।"

এ কি অসম্ভব পাওয়া দেখা দিল কমলের সামনে? তার সারাজীবনের আকাঙ্ক্ষা আজ ধরা দিয়েছে তার হাতে, কিন্তু কি করে তাকে নেবে বরণ করে এ মুহূর্তে? মৃদুস্বরে জবাব দিল সে, "আমাকে যে যেতে হবে ফ্রেডরিক। তোমার কাছ থেকে যা পেলাম তা থাকবে সারাজীবনে অক্ষয় সম্পদ্ হয়ে। আমার জীবনের কোন কথাই তোমার অজানা নেই, যাদের কাছে আমি ঋণী, তাদের ঋণ ত শোধ করতে হবে।"

ফ্রেডরিককে মনে হল অত্যন্ত ক্লান্ত। অতি মৃদুস্বরে সে বলল, "আজ আমি যাই কমল, তোমার বিজয়ের দিনটিকে ম্লান করে দিলাম নিজের কথা বলে, পারো ত মাপ করো আমাকে।"

ধীরপায়ে উঠে চলে গেল ফ্রেডরিক, তাকে ফেরাতে দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়েও ফিরে এল কমল, তা হয় না, সমাজ আর জন্মভূমির ঋণ তাকে শোধ করতেই হবে, তিল তিল করে নিজেকে যদি বঞ্চিত করতে হয় তবুও এর হাত থেকে মুক্তি নেই তার!

পরদিন সন্ধ্যায় যখন ফ্রেডরিক এসে কমলের দরজায় ঘা দিল, বিস্মিত হয়ে গেল কমল তার চেহারা দেখে। একদিনে একি পরিবর্তন! সারাদেহে ক্লান্তির ছাপ, চুল অবিন্যস্ত, অস্ফুটকণ্ঠে বলল ফ্রেডরিক—"কমল কি ভাবছ এত তন্ময় হয়ে? কালকের লালশাড়ী ছিল তাহলে ঝড়েরই সংকেত?" হাসবার চেষ্টা করে সে।

সারাদিনরাত্রির চিন্তার রেশ তখনও কাটেনি কমলের। মৃদুকণ্ঠে সে জবাব দিল, "ফ্রেডরিক আর কটা বছর আগে কেন তোমার সঙ্গে দেখা হল না, তোমাকেই যে আমি খুঁজে বেড়িয়েছি সারাজীবন ধরে। আজ তোমাকে পেয়েছি অথচ তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে এ দুঃখ কি করে বোঝাব?"…নীরবে দাঁড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত ফ্রেডরিক দেখছিল আর একটি হৃদয়ের দ্বন্দ্ব। খোলা জানলার ভিতর দিয়ে ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে চলেছে কমল, "মাঝে মাঝে মনে হয়েছে দু'হাত ভরে গ্রহণ করি অমৃতের পাত্র, আবার নিজের দুর্বলতায় নিজেই হয়েছি লজ্জিত।"

অতি ধীর স্পষ্টকণ্ঠে জবাব দিল ফ্রেডরিক, "না কমল তোমাকে যে ফিরে যেতে হবে—আজ দুদিন ধরে আমিও এই কথাই শুধু ভেবেছি তোমাকে যেতেই হবে- সঙ্গে করে নিয়ে যাও আমার শুভেচ্ছা আর ভালবাসা, কর্মময় ভবিষ্যৎ তোমার হোক উজ্জ্বল।"

আবহাওয়া লঘু করার জন্যে বাইরে বেড়াতে গেল তারা। পথে পথে ঘুরে অভিনন্দন কুড়িয়ে যখন আবার ফিরে এল

ঘরের সামনে রাত তখন ঘনিয়ে এসেছে—আজ দরজার বাইরে থেকেই বিদায় নিল ফ্রেডরিক।

আগামীকাল সাউদাম্পটন বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়বে কমলের। আজ সন্ধ্যায় ছাত্রছাত্রীদের ক্লাবে বিদায় অভিনন্দন জানাল কমলকে। উপহারে উপচারে বিব্রত কমল তাড়াতাড়ি চাইছে গিয়ে বিশ্রাম করতে, না হলে কাল ভোরে সাউদাম্পটন যাবার গাড়ী ধরতে পারবে না সে; কিন্তু ফ্রেডরিকের কাছে ত বিদায় নেওয়া হয়নি, তাকে অনেক্ষণ দেখেনি। বিদায় নেওয়া কি এতই সহজ! ঠিক এমনি সময় কোথা থেকে উদয় হল ফ্রেডরিক, "চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

পাশাপাশি আজও পথ চলেছে তারা, আকাশ আজ মলিন, হেমন্তের তুষার ঝরার জন্য তৈরী হচ্ছে শেষ শরতের প্রকৃতি, ঝরে পড়ছে জরাজীর্ণ পাতার রাশি, বয়ে যাচ্ছে রিক্ত উত্তুরে বাতাস। পথিক দুটিও আজ নীরব—

মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল কমল, "সারাদিনে আজ একবারও তোমাকে দেখতে পাইনি ফ্রেডরিক।"

"সময় পাইনি কমল, তাছাড়া···যাক্ কাল আর দেখা হবে কি না জানি না, যদি কখনও প্রয়োজন হয় জানিও যেখানে যতদূরেই থাকি না কেন তোমার প্রয়োজনে আসতে পারলে আনন্দিত হব।"

"নিশ্চয়ই জানাব, যদি কখনও হাত পাততে হয় তোমারই কাছে পাতব ফ্রেডরিক।"

কমলের হাতহুটি হাতে তুলে নিয়ে ডাকল গভীর স্বরে "কমল—"

চোখতুলে তাকাল কমল, ম্লানমুখ যথাসাধ্য উজ্জ্বল করে কমল জবাব দিল. "আমাকে দুর্বল করে দিওনা ফ্রেডরিক। তোমার শুভেচ্ছাই হয়ে থাক আমার পাথেয়।"

জাহাজ ছাড়বার সময় হয়ে এল, সামান্য সময় বাকি আছে আর। মাইকে হঠাৎ ঘোষিত হল 'মিস্ রায় ভারতের যাত্রী, মিঃ কাউয়েন আপনার দর্শন প্রার্থী, তাড়াতাড়ি করুন সময় মোটেই নেই।' হন্তদন্ত হয়ে জেটির ধারে এল কমল, হাঁফাতে হাঁফাতে এসেছে ফ্রেডরিক। "তুমি রওনা হয়ে যাবার পর এ চিঠিটা এসেছে, হয়তো কোন জরুরী কথা আছে তাই দিয়ে গেলাম, এবার যাই,—"ফ্রেডরিকের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল সে একদৃষ্টে; জাহাজ দুলে উঠল, কূল থেকে রুমাল নেড়ে বিদায় দিল ফ্রেডরিক। চেনা-অচেনা নির্বিশেষে আরও বহু রঙিন রুমালের বিদায়-অভিনন্দন বিষণ্ণ করে তুলল কমলকে। হাতে তার মুঠো করে ধরা চিঠিটা। বিদেশ ছেড়ে যেতেও আজ ব্যথা লাগে তার। যেদিন দেশের মাটি থেকে পা তুলেছিল কমল সেদিন ছিল অজানাকে পাবার আশার সঙ্গে মিশ্রিত সাময়িক বিচ্ছেদের বেদনা, আর আজ বিদেশের মাটি থেকে পা তোলার সময় বাজছে পরিণত জীবনের অসম্ভাবিত প্রাপ্তিকে পিছনে ফেলে যাওয়ার তীব্র ব্যথা। এ দুয়ের তাই তুলনা চলেনা—জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সে রেখে

গেল এইখানে। বিগত তিন বছরে নতুন জীবন লাভ হয়েছে কমলের, অনেক শিখেছে, দেখেছে তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছে তারও অধিক, কিন্তু দেয়নি কিছুই। শুধু ঋণী হয়েই রইল সে পশ্চিমের কাছে।

চিঠিটা খুলে ফেলল কমল। রেখা লিখেছে বহুদিন পর। সাধারণ কুশল জিজ্ঞাসার পর আছে সংবাদ "···· তোমাকে একটা খবর জানানো প্রয়োজন মনে করছি। অরুণ দেশে এসেছিল দু'বছর ভূটানসীমান্তে কাজ করার পর। সেখানকার অসহ্য নীরবতায় হাঁফিয়ে উঠেছিল নিঃসঙ্গ অরুণ, মা ও মারা গিয়েছেন বছরখানেক হল। মাস দুয়েক দেশে বাস করে চাঁপাকে বিয়ে করে আবার সেখানে ফিরে গিয়েছে অরুণ। সেখানে হাসপাতালে অরুণ করবে ডাক্তারী আর ছোট স্কুলটিতে চাঁপা করবে মাষ্টারী।

"এতকাল তোমাকে জানাইনি তুমি কিভাবে খবরটা নেবে বুঝতে পারছিলাম না। পরস্পর জানতে পারলাম তুমি বিদেশকেই ঘর করার সঙ্কল্প করেছ, তাই তোমাকে আমাদের দিক থেকে মুক্তি দেবার জন্য এই চিঠি লিখলাম। আশা করি আমাকে ভুল বুঝবে না। মাঝে মাঝে সময় পেলে খবরাখবর দিও।

ইতি, রেখাবৌদি।

পুনশ্চ—চাঁপার মেয়েকে তার ভাসুররা রেখে দিয়েছেন, তাঁরা নাকি তাঁদের বংশের মেয়েকে সৎ-বাপের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন না।"

চিঠি থেকে যখন মুখ তুলল কমল ইংল্যাণ্ডের উপকূল তখন সরে গিয়েছে দৃষ্টি সীমানার বাইরে। ক্রমবিলীয়মান তটরেখার দিকে তাকিয়ে রইল সে ব্যাকুল দৃষ্টিতে। বহুদিনের রুদ্ধ নিরুপায়ের অশ্রু ক্রমশঃ ঝাপ্‌সা করে দিল অতলান্তিকের জলরাশিকে, দূরগামী জাহাজের ইঞ্জিন তখন শব্দ করে চলেছে ঝক্‌···ঝক্‌···ঝক্‌······